রাজনৈতিক রিপোর্ট

চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত

(এপ্রিল, ২০১৭)

পার্টির চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত
রাজনৈতিক রিপোর্ট

প্রকাশক ঃ কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

দাম ঃ ৫০ টাকা

নোট ঃ

এই দলিলটি হলো পার্টির ৪র্থ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত **"রাজনৈতিক রিপোর্ট"**। *রিপোর্টের শেষ অধ্যায়টি হলো আমাদের পার্টির বর্তমান পরিস্থিতি এবং করণীয় বিষয়ক। তার কিছু কিছু অংশ– বিশেষত সামরিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত অংশ, শুধুমাত্র পার্টির অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সে অংশগুলো এখানে উহ্য রয়েছে এবং ডট্ (... ...) দ্বারা সে জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।*

এই রিপোর্টটি প্রথম রচিত হয়েছিল ২০১৬ সালের মাঝামাঝিতে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সম্পাদক কমরেড আনোয়ার কবীর দলিলটি রচনা করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় কমিটি এটি অনুমোদন করে। এর পর দলিলটির উপর অধ্যয়ন-আলোচনা ও মত গঠনের জন্য পার্টির সর্বস্তরে এটি পেশ করা হয়। যা ঐ বছরের শেষাংশ জুড়ে পরিচালিত হয়। ২০১৭ সালের প্রথম দিকে সূচিত পার্টির ৪র্থ কংগ্রেসে দলিলটি আলোচিত হয় এবং বেশ কিছু সংশোধনী-সংযোজনীসহ গৃহীত হয়। এপ্রিল,'১৭-এ কংগ্রেস দলিলটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে।

দলিলটি প্রথম রচিত হওয়া, তারপর একটা বড় সময় পর তা কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া, এবং তারও কয়েকমাস পর এটি প্রকাশ হওয়ার কারণে বেশ কিছু নতুন পরিস্থিতিকে দলিলটি ধারণ করতে পারেনি, যা স্বাভাবিক। তবে এপ্রিল, ২০১৭-এ কংগ্রেস যখন দলিলটি গ্রহণ করে তখন তাকে সে সময় পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিকাশকে যতটা সম্ভব ধারণ করে কিছুটা আপটুডেট করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যার ভিত্তিতে দলিলটি কিছুটা সংশোধিত-সংযোজিত হয়েছে। তবে দলিলের মূল অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। শুধু ঘটনাবলীর আলোচনায় তা কিছুটা পেছনের সময়কে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আশাকরি পাঠকবৃন্দ দলিলটি পাঠের সময় এ বিষয়টি খেয়ালে রাখবেন।

– কেন্দ্রীয় কমিটি, পূবাসপা।
১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সূচিপত্র ঃ

১। প্রেক্ষাপট/ভূমিকা/৭
২। বিশ্ব পরিস্থিতি/১০
আঞ্চলিক পরিস্থিতি/১৫
দেশীয় পরিস্থিতি/১৮
৩। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন/৩৩
৪। দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন/৪১
৫। ৩য় কংগ্রেস মূল্যায়ন/৫০
– রাজনৈতিক লাইন/জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি/৫০
– রাজনৈতিক লাইন/আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ/৫১
– সামরিক লাইন/৬০
৬। আমাদের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়/৬২
৭। উপসংহার/৭১

(১)

ভূমিকা/প্রেক্ষাপট

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ৪র্থ জাতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ডেলিগেট ও পর্যবেক্ষক কমরেডগণকে অভিনন্দন।

বিগত জাতীয় সম্মেলনের প্রায় ৬ বছর পরে আমরা যখন এই কংগ্রেস অনুষ্ঠান করছি তখন ইতিমধ্যে আমাদের থেকে হারিয়ে গেছেন দেশে ও বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ মালেমা-বাদী নেতা, কমরেড ও জনগণ। তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই রিপোর্ট পেশ করছি।

পার্টির বিগত "জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন"-টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে। সেটি ছিল কংগ্রেস সমতুল্য একটি অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীদের বিচারে তা ছিল সমগ্র পার্টির প্রতিনিধিত্বশীল, এবং লাইনগত ভূমিকার বিচারে এটা পার্টি-ইতিহাসে অন্য যেকোন সম্মেলনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, তা শুধু পার্টির নয়, এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের ৪-দশকের অভিজ্ঞতার মৌলিক সারসংকলন করেছিল। একইসাথে তা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন মহাবিতর্কের মৌলিক কিছু বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল।

তাই, বর্তমান এই রিপোর্টটি ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলনের পরবর্তী সময়কালে সিসি'র কার্যক্রমের রিপোর্ট হিসেবে পরিগণিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবত সেই সম্মেলনে গৃহীত "নতুন থিসিস"টি ৩য় কংগ্রেস ও সার্বিকভাবে চার-দশকের মাওবাদী আন্দোলনের মূল সারসংকলন উপস্থিত করেছিল। তাকে মূলত সঠিক বলেই আমরা মনেকরি।

* তবে এটাও সঠিক যে, তখন তাকে কংগ্রেস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এর পেছনে কিছু বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের ঐতিহ্যগত কিছু অপরিপক্ক ধারণা কাজ করেছিল। প্রথমত আমরা আশা করেছিলাম যে, ৪-দশকের মাওবাদী আন্দোলনের সারসংকলনের ভিত্তিতে সমগ্র আন্দোলনে আলোচনার জন্য কিছু সময় নেয়া উচিত, যার ফলশ্রুতিতে মাওবাদী আন্দোলন ও পার্টিকে পুনর্গঠিত করায় নতুন কিছু পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে। আমরা ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠার একটা সম্ভাবনাকেও, কিছুটা হলেও, হিসেবে রেখেছিলাম। সে কারণে আমরা আশা করেছিলাম যে, পার্টির কোন ঐক্য-কংগ্রেস অথবা মাওবাদীদের ঐক্যবদ্ধ পার্টির জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে কিছু সময় দেখে তারপর কংগ্রেস– তা সেটা যেভাবেই হোক না কেন, করা উচিত। যা অবশ্য সেভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।

দ্বিতীয়ত, লাইনগত গোছগাছ সম্পূর্ণ করে এবং বৃহৎ পরিসরে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের একটি দুর্বল ধারণা আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘদিন ধরেই ক্রিয়াশীল ছিল। যাতে শর্ত দিতো গোপন বিপ্লবী পার্টি হিসেবে কংগ্রেসের মত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিকূলতাগুলো। বিশেষত শত্রুর দমনের বাস্তবতাগুলো। যাহোক, সিসি এখন মনে করে যে, যতটা সম্ভব নিয়মমাফিকই কংগ্রেস অনুষ্ঠান করা উচিত। লাইন ও তার সারসংকলন, এবং সাংগঠনিক সুসংহতকরণকে সম্পূর্ণতা দান, বা বৃহৎ ও জাঁকজমক পরিসরে সেটা অনুষ্ঠান করা যাক বা না যাক, জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানকে কংগ্রেস হিসেবে গ্রহণ করাটাই সঠিক।

এছাড়া, কংগ্রেস ও জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের মধ্যকার পার্থক্যটা কী তা খুব একটা ভালভাবে আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করা হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা চলে যে, এদুটোকে মৌলিকভাবে পৃথক করার যুক্তি নেই। যদিও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে সংবিধানের সংশোধনীর প্রশ্নেও আলোচনা হওয়া উচিত।

তবে বিগত সময়ের কাজের সামগ্রিক সারসংকলন ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে কংগ্রেস আকারে না করা হলেও ৩য় কংগ্রেসের পর বিগত সময়ে নিয়মিত বিরতিতে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ফোরামের সমাবেশ আমরা করেছি। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে পার্টির ৩য় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পর থেকে নিয়মিত বিরতিতেই পার্টির সংবিধান ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কয়েকটি সম্মেলন বা বর্ধিত অধিবেশন করা হয়, যেগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল। কমরেডগণ জানেন যে, ৩য় জাতীয় কংগ্রেসের কিছু পর থেকে পার্টিতে একটি বৃহৎ আকারের দুই লাইনের সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ১৯৯৬ সালের জুন মাসে সিসি'র ১ম বর্ধিত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়, যাতে দুই লাইনের সংগ্রামের সকল পক্ষের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধি এবং শাখাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। যাকে পার্টির নেতৃস্থানীয়-গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সম্মেলনও বলা হয়ে থাকে। ১ম বর্ধিত সভার পর দুই লাইনের সংগ্রামটি আরো তীব্রতা অর্জন করে, এবং ১৯৯৮/৯৯ সালে ভিন্নমতকারী কমরেডগণ পার্টি ত্যাগ করে নতুন দুটো কেন্দ্র– এমবিআরএম ও এমপিকে/মাপুকে গঠন করেন। এটা ছিল পার্টি-ইতিহাসে অন্যতম প্রধান বিভক্তি, ৩নং বিভক্তি। (প্রথম বিভক্তিটি হয়েছিল কমরেড সিরাজ সিকদারের জীবিতাবস্থায় ১৯৭২ সালে, যাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল 'ফজলু-সুলতান চক্র' নামের গ্রুপটি; আর দ্বিতীয় প্রধান বিভক্তি ঘটেছিল কমরেড এসএস-এর মৃত্যুর পর, ১৯৭৫/৭৬ সালে, যখন 'সবিপ', 'অপক' ও 'সত্তা'– এই তিনটি প্রধান অংশে পার্টি ভেঙ্গে গিয়েছিল)। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালের জুলাই মাসে ২য় বর্ধিত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রায় ৮ বছর পর ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলনটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে– যা দেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের ৪-দশকের লাইনের মৌলিক সারসংকলন করে।

সুতরাং, আমাদের পার্টিতে বিভিন্ন জটিল বাঁকগুলোতে লাইনগত মূল্যায়ন ও অভিজ্ঞতার সারসংকলনের জন্য নিয়মিত বিরতিতে সাংবিধানিক ও গঠনতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিবিধ ফোরামে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে এবং একইসাথে কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ ও ২০০২-এর বর্ধিত সভাগুলোতে ৩য় কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। তবে ২০১১-এর সম্মেলনে ৩য় কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও আমাদের পার্টির এবং দেশে ও বিশ্বজুড়ে আমাদের আন্দোলনের জটিল ও অনেকটা সংকটজনক আজকের পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে, ছোট বা বড় যে আয়োজনেই হোক না কেন, মোটামুটি সময় মেনে কংগ্রেস অনুষ্ঠান করাটাই যথাযথ। কারণ, একদিকে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগত প্রশ্নগুলো ধাপে ধাপে মীমাংসা করেই আমাদের এগুতে হবে, একবারে সুসংহত করে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের চেতনাটা সঠিক হয়না। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় পর পর নেতৃত্বের পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়। নেতৃত্ব গড়ে তোলা ও তার ধারাবাহিকতার জন্য এটা অপরিহার্য। এগুলো কংগ্রেস মাধ্যমেই করার রীতি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করা ও ট্রেইন করা এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্ভরতা কাটানোর জন্য এখনকার চেয়ে জরুরি সময় আর আসেনি। এজন্য নিয়মিত কংগ্রেস করার গুরুত্ব অপরিসীম। পার্টিকে টিকিয়ে রাখা ও পরবর্তী যুগে বহমান রাখার জন্য এটা অপরিহার্য। গোপন বিপ্লবী পার্টি বিধায় সদা শত্রুর দমনের মধ্যে থাকা এবং বহুবিধ প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার কারণে আমাদের পরিস্থিতি অন্য আর দশটা 'বাম' নামধারী পার্টির সাথে মিলবে না এবং তাকে মিলানো সঠিক হবে না। আমাদের ক্ষেত্রে সীমিত প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে অনেক সময়ই অনুসরণ করতে হতে পারে। তাই, আমাদের মত করেই আমাদের কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজও করতে হবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক চর্চাটিকে এখন যতটা বেশি আকারে সম্ভব শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

* আমরা যখন এ কংগ্রেসটি অনুষ্ঠান করছি তখন সারা বিশ্বজুড়ে এবং তারই অংশ হিসেবে আমাদের দেশেও প্রতিক্রিয়ার একটি ঢেউ বয়ে চলেছে। একদিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এক বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, যার ফলস্বরূপ বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনও বড় আকারে দুর্বল হয়ে গেছে। আর সেই জায়গা দখল করেছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাস দমনের নামে জনগণের বিরুদ্ধে চালিত অন্যায় যুদ্ধ, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ির নতুন এক পর্ব, যা প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের ধ্বংস ও বর্বরতার মাঝে জনগণকে নিক্ষেপ করেছে। এবং তারই অনুষঙ্গ হিসেবে গজিয়ে উঠেছে তথাকথিত ধর্মীয় মৌলবাদ, বিশেষত ইসলামী জঙ্গি মৌলবাদ, যাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচি ও কর্মকান্ড যেমন একদিকে জনগণকে আরো পিছন দিকে হাঁটবার নির্দেশ করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের ক্ষোভ, চেতনা, সংগ্রাম, ত্যাগ ও কর্মোদ্যমকে বিপথগামী করছে। পাশাপাশি এই

মৌলবাদ জুজুর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রগুলো ও শাসকশ্রেণি, বিশেষত আমাদের মত দেশগুলোতে, ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দেয়া ও ফ্যাসিকরণকে শক্তিশালী করার এক মওকা পেয়ে গেছে। এসমস্ত বিষয়গুলোকেই নিচে আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরবো, আমাদের সবলতা-দুর্বলতাকে তুলে ধরবো, বিশেষত বিগত জাতীয় সম্মেলন পরবর্তী আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করবো এবং তারই প্রেক্ষিতে তুলে ধরবো আমাদের দেশের আন্দোলন-পরিস্থিতি, তার সারসংক্ষেপ ও এখনকার করণীয়কে।

(২)

বিশ্ব, আঞ্চলিক ও দেশীয় পরিস্থিতি

বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ

৯০-দশকটি শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্র নামধারী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের মধ্য দিয়ে। যদিও এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই সংকট, কিন্তু একইসাথে একে "সমাজতন্ত্রের পতন" নামে অভিহিত করে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী অভিযান শুরু করেছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও চিরস্থায়ীত্বর মিথ্যা আবহ সৃষ্টি করা। এটা কমিউনিজমের আদর্শের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে ও বিশেষত মধ্যবিত্তদের মাঝে হতাশা বৃদ্ধিতে কম/বেশি ভূমিকা রেখেছিল।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের পরিস্থিতিতে মার্কিনের নেতৃত্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা "বিশ্বায়ন" নামে এক নতুন কর্মসূচি হাজির করে, এক-মেরু বিশ্বের অবতারণা করে এবং বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশ অনেক জোরালো হয়ে ওঠে। এই দেশগুলোতে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার বিরাট বিকাশ, অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থার সাথে আরো বেশি একীকরণ, বিশেষত কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, একটি সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, নগরায়নের বিরাট জোয়ার এবং এসবের মধ্য দিয়ে একধরনের বিকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এটা বিপ্লব ও জন-আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতেও ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে "বিশ্বায়ন" নামে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ, লুণ্ঠন, শোষণ, নিয়ন্ত্রণ, বিকৃতকরণ, পরিবেশ ধ্বংস– এসবের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরকম এক পরিস্থিতিতে "বিশ্বায়ন" কর্মসূচি প্রকৃত কমিউনিস্ট আদর্শের অগ্রাভিযানকে দুর্বল

করতে পারেনি, যদিও বিবিধ বিভ্রান্তি ও সুবিধাবাদ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এবং '৮০-দশকে "রিম" (RIM-- Revolutionary Internationalist Movement-- বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালেমা-বাদী যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠিত হওয়া শুরু করেছিল, পেরুর গণযুদ্ধ এবং ভারত-বাংলাদেশ-ফিলিপাইন-তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন তাকে বিরাটভাবে এগিয়ে নেয়। কিছু পরে '৯৬-সাল থেকে নেপালে গণযুদ্ধ শুরু হলে তার আরো বড় অগ্রগতি সাধিত হয়।

২০০১ সালে টুইন টাওয়ার ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী পলিসির বড় মোড় ঘোরাকে শর্তায়িত করে। শুরু হয় "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ" নামে বিশ্বের জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এক অন্যায় যুদ্ধের নতুন পর্ব। এটা ছিল "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ"-র নামে বিশ্ব জনগণের বিরুদ্ধে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর জনগণের বিরুদ্ধে এক নির্মম বর্বর অন্যায় আগ্রাসন। কিন্তু একইসাথে এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের অভ্যন্তরে নতুন বিকাশমান অন্তর্দ্বন্দ্ব'র পরিস্থিতিতে মার্কিনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের তেল-জ্বালানী ও বিশ্বের রণনৈতিক অঞ্চলগুলোর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুগপৎ লক্ষাভিমুখী কর্মসূচি। এটা যে তাই ছিল সেটা বর্তমান এই দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকে আরো স্পষ্ট হতে থাকে। ইউক্রেন নিয়ে রুশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রক্সি যুদ্ধ, এবং সর্বশেষ সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হস্তক্ষেপ– এগুলো কার্যত মার্কিনের একক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নতুন চ্যালেঞ্জকে প্রকাশ করে; যা একমেরু বিশ্বের অবসান এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পুনরায় তীব্র হয়ে ওঠার মাধ্যমে পুনর্বার দ্বিমেরু বিশ্বের দিকে দুনিয়াকে চালিত করার আলামত।

এই নতুন মেরুকরণে সাম্রাজ্যবাদ-অভিমুখী পুঁজিবাদী চীনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, যা এখনো প্রক্রিয়াধীন। তবে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিনের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব, এবং ইরান, সিরিয়া ইস্যুতে রাশিয়ার সাথে চীনের ক্রমবর্ধিত ঘনিষ্ঠতা মেরুকরণের চরিত্রের ও শক্তিসমাবেশের একটা ধারণাকে প্রকাশ করছে। যা আপাতত অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। চীন, রাশিয়ার উদ্যোগে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদির বিপরীতে 'ব্রিকস' (BRICS) গঠন তারই একটি প্রকাশ, যদিও এটি কতটুকু এগিয়ে যাবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

– ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আগ্রাসনের মাধ্যমে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বজনগণের বিরুদ্ধে যে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছিল, তার বিরুদ্ধে সাথে সাথেই সারা বিশ্বে নতুন প্রতিবাদ আন্দোলন, বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতেই যদিও পেরুর গণযুদ্ধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নেপালের মাওবাদী নেতৃত্বে গণযুদ্ধ নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে বিশ্ব জনগণের সামনে মুক্তির

দিশাকে তুলে ধরা শুরু করেছিল। এ সময়টাতে ভারতেও মাওবাদী নেতৃত্বে গণযুদ্ধ ও সংগ্রাম বড় অগ্রগতি অর্জন করে। বিশ্বজুড়ে মার্কিনের "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ"র নামে অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এসবই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।

– এরই পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মন্দা পরিস্থিতি তার সংকটকে বহুমুখী করে তোলে। খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজ দেশে বেইল আউটের মত পলিসির দ্বারা সংকট কাটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বিগত গোটা দশক জুড়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে একের পর এক মন্দার আঘাত নেমে আসে। যার সবচাইতে বড় সংকটটা দেখা যায় গ্রিসের প্রায়-ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে। কিন্তু শুধু গ্রিসই নয়, ইতালী, পর্তুগাল, স্পেনসহ অনেক রাষ্ট্রই সমূহ অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়।

– সাম্রাজ্যবাদের এই সংকট-পরিস্থিতি তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিসর, সিরিয়া, বাহরাইন, ইয়েমেন, এমনকি সৌদি আরব পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে "আরব বসন্তের" এক নতুন জন-আন্দোলনের ঢেউ গড়ে তোলে। এসবই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সংকটকে বৃদ্ধি ও আরো বহুমুখী করতে ভূমিকা রাখে। আরব বসন্তের ফলশ্রুতিতে কিছু দেশে বহু বছর ধরে চলে আসা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে, কোথাও-বা তার উপক্রম হয়। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মসূচির অভাবে এই জন-আন্দোলন ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। বরং কোথাও কোথাও সংস্কারের মাধ্যমে, আর কোথাওবা অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে জোরালো করে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখে। একইসাথে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরকে তারা সুচারুরূপে কাজে লাগায়/ব্যবহার করে জনমুখী কোন পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য। পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী জঙ্গি মৌলবাদের নতুন বিকাশ ঘটে, যদিও তা সাম্রাজ্যবাদের নতুনতর সংকটের কারণও হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের গণতন্ত্রের মুখোশ আরো বেশি করে খুলে পড়ে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ করে এবং তার প্রমাণ রাখে। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ তার ব্যর্থতা, গণবিরোধিতা ও অচল হয়ে পড়ার প্রমাণ পুনরায় হাজির করে।

একইসাথে তা খোদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে পুঁজিবাদী লুণ্ঠন, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল জনগণের বিবিধ আন্দোলন গড়ে তোলে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজ দেশে 'অকুপাই আন্দোলন' ও গত বছর গ্রিসে তথাকথিত 'কৃচ্ছতা কর্মসূচি'র নামে জনগণের উপর বর্ধিত ট্যাক্স আরোপ, জনকল্যাণমুখী বিবিধ কর্মসূচিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, ছাঁটাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। এসব ছাড়াও মার্কিনসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীদের অধিকার আন্দোলন, কালো মানুষ অভিবাসী ও গৃহহীনদের আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্ব-উষ্ণায়ন বিরোধী আন্দোলন

স্থায়ীভাবেই বিরাজমান। উপরে উল্লিখিত দফায় দফায় অর্থনৈতিক মন্দা এসব জন-আন্দোলনকে আরো গতিশীল করেছে।

কিন্তু এখানেও বিপ্লবী কর্মসূচি, আদর্শ, পার্টি ও সংগ্রামের দুর্বলতা বা অভাবের কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে ফ্যাসিবাদের দিকেও পরিচালিত করছে। খোদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের মত এক বর্ণবাদী চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াটা ঐসব সমাজের সংকট ও ফ্যাসিবাদ অভিমুখীনতাকে নগ্ন করে দিচ্ছে।

– এসব সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ অর্থনীতিকেই ভরসা করে। যা এখন সিরিয়াকে ঘিরে সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, কুর্দিস্থান, ইরান, বাহরায়েন, ইয়েমেন, লিবিয়া, আফগানিস্তান, আফ্রিকায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সিরিয়া-কেন্দ্রীক এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের সংকট মোচনের বদলে তাদের নতুন নতুন সংকটে ফেলছে, যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিবাসী সংকট, যাতে সমগ্র ইউরোপে এক গুরুতর মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর মোকাবেলায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মানবতার মুখোশও খুলে পড়েছে। এমনকি এটা সেসব দেশে নব্য ফ্যাসিবাদের বিকাশ ডেকে আনছে। শাসকশ্রেণির একাংশ ফ্যাসিবাদে আশ্রয় নিচ্ছে। যেমনটা দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বৃটেনের গণভোটে ব্রেক্সিটের জয়লাভ ও তার ইইউ ত্যাগ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। এটা বৃটেনের মত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মডেল দেশেও উগ্র জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী হওয়াকে প্রকাশ করে, যা কিনা ফ্যাসিবাদের ভ্রূণ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যদিকে মার্কিন ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে এসবই প্রায় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের হুমকির মত পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করেছে।

– এরকম অবস্থায় প্রথমে আল কায়েদা ও তালেবান, ও পরে আইএস-এর মাধ্যমে ও নেতৃত্বে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি আন্দোলনের পুনবিকাশ লক্ষ করা যায়।

এই মৌলবাদী শক্তি যে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারাই সৃষ্ট, সৌদী ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে মার্কিনের দালাল শাসকশ্রেণির দ্বারা মদদপ্রাপ্ত, তাদের দ্বারা লালিত পালিত ও আশ্রিত– তা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা এদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিল আফগানিস্তানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, এবং সর্বদাই ও সর্বত্রই প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলন, প্রগতিশীল আন্দোলন, জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামকে বিপথগামী করার জন্য। কিন্তু আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মসূচিগত কারণে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সাথে এদের একাংশের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বিকশিত হয়। এটা একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সংকট সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু একইসাথে বিপ্লব, জনগণ ও

প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তারা একে কাজেও লাগাতে পারে। মৌলবাদীদের পশ্চাদমুখী আদর্শ ও কর্মসূচি, বিশেষত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাদের ফ্যাসিস্ট অবস্থান, বিশেষত নারী-প্রশ্নসহ বিবিধ সামাজিক কর্মসূচিতে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ লালন ও বৃদ্ধিকরণ এবং মধ্যযুগীয় ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার কারণে সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের ঐতিহাসিক গাঁটছড়াকে ভুলে গেলে চলবে না। জনগণের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের বর্বর আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদের জনগণবিরোধী ও বিপ্লববিরোধী কর্মসূচিকেই বিপুলভাবে সহায়তা করে। পাশাপাশি মৌলবাদবিরোধী ধুয়া তুলে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে আড়াল রাখে ও নিজেদের অচল হয়ে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থার ন্যায্যতা সৃষ্টি করতে চায়।

একইসাথে সাম্রাজ্যবাদের কোন না কোন পক্ষের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের কিছু অংশের সীমিত লড়াই-এর বাস্তবতাকেও গুরুত্বহীন করা যাবে না। কিন্তু এ বিষয়টিতে অবশ্যই পরিস্কার থাকতে হবে যে, এই সমগ্রটা নিয়েই আজকের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা গঠিত। সাম্রাজ্যবাদ আর মৌলবাদ কোন বিপরীত মেরুর বিষয় নয়। এবং তারা সমপর্যায়েরও নয়। সাম্রাজ্যবাদই হলো বিশ্বজনগণের মৌলিক শত্রু। মৌলবাদ হলো তারই অনুষঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদ আর মৌলবাদকে একই কাতারে বিচার করা কার্যত সাম্রাজ্যবাদের মূল সমস্যা সম্পর্কে বিপ্লবী অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। উপরন্তু, মৌলবাদকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্তিশালী করায় সাহায্য করে, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নামে সারা বিশ্বজুড়ে করা হচ্ছে।

এ কারণেই যখন মৌলবাদীদের একাংশ সাম্রাজ্যবাদীদের একাংশের বিরুদ্ধে সীমিত লড়াই করে, এবং যখন বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তরুণ ও সংগ্রামীদের একটা বিভ্রান্ত অংশ তাতে যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের কোন না কোন ব্যাখ্যা তাদেরকে আদর্শিক জোগান দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা ও 'আদর্শহীনতা'র বিরুদ্ধে ইসলামের কোন কোন ব্যাখ্যার নৈতিকতা ও আদর্শিক জোগানকে ছোট করে দেখলে চলবে না, যতই তা পশ্চাদমুখী হোক না কেন, যাকে আবার এই বিশ্বব্যবস্থাই শক্তি জোগায়। একই কারণে বিপরীত রূপের ধর্মীয় মৌলবাদী ফ্যাসিবাদের নতুন বিকাশ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই অমুসলিম দেশসমূহে। ইসরাইলের ইহুদীবাদী ফ্যাসিবাদ ছাড়াও সম্প্রতি ভারতের মত এক বিরাট 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে' হিন্দুত্ববাদের বিকাশ, পশ্চিমা দেশগুলোতে খ্রীষ্টীয় ফ্যাসিবাদের বিকাশ, এমনকি আমেরিকার নির্বাচনে পর্যন্ত তার ব্যাপক প্রকাশ বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল ঢেউকে প্রকাশ করে। এগুলো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থারই অনুষঙ্গ, তার রোগ-বালাই, তার সংকট; একইসাথে বিপ্লব, কমিউনিজম, জনসংগ্রাম ও জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ তাকে লালন-পালন করেও চলেছে। সীমা অতিক্রম করলে তার সীমিত নিয়ন্ত্রণ, এবং অন্যসময় তার শয়তানী/ধূর্ত ব্যবহার

তারা করে চলেছে। যা বিশ্ব জনগণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদেরই 'উপহার'। শুধু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস করেই জনগণ এ থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

আঞ্চলিক পরিস্থিতি ঃ

উপরোক্ত বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক পরিস্থিতিরও মূল নিয়ামক। তবে এখানকার কতকগুলো বিশেষ অবস্থাও মনোযোগের দাবিদার।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সুদীর্ঘকাল ধরে কাজ করছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। চীন-বিপ্লবের পর থেকে এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান খুঁটি ছিল ভারতীয় শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনকে ঘেরাও করার কর্মসূচিতে ভারত ছিল তাদের প্রধানতম আঞ্চলিক শক্তি। কিন্তু রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের পর থেকে ভারত এই অধঃপতিত রাশিয়ার সাথেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। '৬২-সালের চীনবিরোধী যুদ্ধে সে রাশিয়াসহ সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের সমর্থন পায়। কিন্তু রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদে বিকশিত হওয়ার পর, এবং মার্কিনের সাথে তার আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠলে, বিশেষত '৭১-সালের যুদ্ধের পটভূমিতে ভারত প্রধানভাবে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলয়ে আশ্রয় নেয়।

যদিও সোভিয়েতের পতনের পর মনমোহন সিং-এর সংস্কার কর্মসূচির বদৌলতে ভারত পশ্চিমাদের ভাল বন্ধুত্ব অর্জনে পুনরায় সক্ষম হয়েছে, তবুও রুশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর। এর একটা বড় কারণ পাকিস্তানের সাথে তার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমাজতান্ত্রিক চীনের সাথে পাকিস্তানের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ভারতের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। কিন্তু শীতল যুদ্ধের আমলে, চীন অধঃপতিত হয়ে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হবার পর, এবং বিশেষত বিশ্ব পরিসরে রুশ-চীন বন্ধুত্ব, বিপরীতে রুশ-মার্কিন ও চীন-মার্কিন দ্বন্দ্ব'র বৃদ্ধি– এ বিষয়গুলো ভারতের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। ভারত ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার সাথে অস্ত্র-বাণিজ্য, পারমাণবিক জ্বালানী ইত্যাদি নির্ধারক বিষয়ে সম্পর্কিত ছিলই, যা বর্তমানে বিকশিত হচ্ছে। এর সূত্র ধরেই চীনের সাথেও ভারতের বর্তমান বিকাশমান সম্পর্ককে দেখতে হবে। কিন্তু ভারত-চীন সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে বৈরী এবং পাকিস্তান, যা ভারতের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, তার সাথে চীনের বন্ধুত্ব– এসবই সহজে বদলে যাবার বিষয় নয়। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনের আটকে পড়া, তার অর্থনৈতিক সংকট, এবং ভারত ও পাকিস্তানের সাথে রাশিয়া ও চীনের এইসব সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব– এগুলোকে মার্কিন একদিকে ব্যবহার করতে চাইছে, অন্যদিকে এক্ষেত্রে তার কিছু সীমাবদ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

ভারতকে হাতে রেখেই দক্ষিণ এশিয়ায় তার কর্মসূচিকে চালিয়ে নিতে চায়। বিশেষত ভারত, নেপাল ও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলন, জাতিগত সংগ্রাম ও জনগণের বিবিধ আন্দোলনকে দমন ও বিপথগামী করার জন্য ভারতীয় শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র মার্কিনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্ব পরিসরের বিকাশমান দ্বন্দ্বগুলো কিভাবে রূপ নেবে তা এখনই চূড়ান্ত নয়। এসবের প্রভাব পড়ছে ভারতের, দক্ষিণ এশিয়ার ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের ভারত নিয়ন্ত্রিত ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপগুলোকে আমেরিকার পক্ষ থেকে এক ধরনের মেনে নেয়ার অন্যতম মূল কারণ এটাই।

কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো এখানকার মাওবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা, প্রভাব ও শক্তিমত্তা। সাম্প্রতিক অতীতে নেপাল ও ভারতের মাওবাদী বিপ্লবের বিরাট অগ্রগতি শুধু ভারতের নয়, গোটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছিল। তবে বিগত দশকে নেপালের মাওবাদী আন্দোলন প্রচণ্ড-ভট্টরায় চক্র দ্বারা অধঃপতিত হওয়ায় এবং ভারতের বিপ্লব বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের কিছু স্বস্তির কারণ ঘটেছে। কিন্তু নেপালে আন্তরিক মাওবাদীরা পুনর্গঠিত পুনর্সজ্জিত ও বিপ্লব পুনর্সূচনার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হচ্ছেন। ভারতের মাওবাদী নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন গত দশকে বড় ধরনের বিকাশের পর রাষ্ট্রের সামগ্রিক আক্রমণে বেশ কিছুটা সংকটের মধ্যে থাকলেও শাসকশ্রেণির কাছে তা এখনও প্রধানতম বিপদ। ভারতের মনিপুর, কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলসহ বিবিধ জাতিগত আন্দোলন এখানকার জন-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এছাড়াও ভারতে কৃষক, আদিবাসী, দলিত, নারী ও শ্রমিক শ্রেণির শক্তিশালী আন্দোলন রয়েছে। যদিও এসবের বিরাট অংশ অর্থনীতিবাদী, সংস্কারবাদীদের করায়ত্বে, কিন্তু জনগণের এসব আন্দোলন বহমান, যা শাসকশ্রেণীর জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে যদি এগুলোতে মাওবাদী কমিউনিস্ট প্রভাব পুনরায় বাড়তে শুরু করে।

ভারতীয় বড় বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ ক'রে, বিপুল খনিজ সম্পদ লুট ক'রে প্রবৃদ্ধির যে চমক সৃষ্টি করেছে তা দেখিয়ে জনগণকে দমাতে চায় ও বিভ্রান্ত করতে চায়। তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক বামপন্থী এই চমককে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ বলে দেখাতে চায়। কিন্তু ভারতের শাসকশ্রেণি শুরুতেও ছিল মুৎসুদ্দি, এখনও তা-ই রয়ে গেছে। ভারত মনমোহন আমলে এবং বর্তমানেও সাম্রাজ্যবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ও তার উপর নির্ভরশীল। একটি বৃহৎ সম্পদশালী বিরাট জনসংখ্যার দেশের শাসক শ্রেণি হিসেবে মুৎসুদ্দি পুঁজির বিপুলায়তন বিকাশের কারণে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দরাদরির সক্ষমতা তার বেড়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ-ক্ষমতা বেড়েছে, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে খবরদারির ক্ষমতা বেড়েছে, দেশের বাইরে কিছু জায়গায় মুৎসুদ্দি পুঁজি বিনিয়োগের সক্ষমতা হয়েছে–

এসব সত্য। কিন্তু এই আমলা মুৎসুদ্দি শাসকশ্রেণি একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের কোন না কোন পক্ষ বা সব পক্ষের সাথেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গাঁটছড়া বাধা, অন্যদিকে দেশের ভিতরে তারা চালু রেখেছে অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক– রাজনীতি, সংস্কৃতি ছাড়াও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে। এই সব কারিকার যোগফল হিসেবে ভারত একটি সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে এ অঞ্চলে জনগণ ও বিপ্লবের প্রধানতম আঞ্চলিক শত্রু হিসেবে কাজ করছে। যা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্যও এক বিরাট হুমকি, যেমনটা নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভূটানসহ সকল প্রতিবেশী দেশেরও। সে কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলোর জনগণের জাতীয় শত্রু হিসেবে নিপীড়ক ভূমিকা রাখছে। ভারত কখনই বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশ এবং তাদের জনগণের বন্ধু ছিলনা; নিজ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোরও নয়। এখনো তা নয়। '৭১-সালের তথাকথিত 'বন্ধুত্ব' যে ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু পাকিস্তানকে দুর্বল করার একটি সরল পদক্ষেপ মাত্র, এবং জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিপথগামী, প্রতারণা ও অঙ্কুরে ধ্বংস করার মাধ্যমে নিজ সম্প্রসারণবাদী স্বার্থ হাসিলের ষড়যন্ত্র– তা উপলব্ধি করা এদেশ ও ভারতের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য খুবই জরুরি।

সম্প্রতি ভারতে হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উলঙ্গ বিকাশ ও তাদের আশীর্বাদের দল বিজেপি'র সরকার গঠন এ বিপদকে আরো তীব্র করেছে। তারাও সাম্রাজ্যবাদীদের মতই ইসলামী মৌলবাদের জুজু ব্যবহার করছে জনগণ ও বিপ্লবকে দমনের জন্য। সেখানে মুসলিম ও নিম্নবর্গের জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী ফ্যাসিস্ট আক্রমণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলোর জনগণের উপর, এবং ভারতজুড়ে ছড়ানো কোটি কোটি আদিবাসী জনগণের উপর বর্বর জাতিগত নিপীড়ন পরিচালনা করছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ফানুস ফেটে পড়ার উপক্রম, যদিও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিকেরা এই গণবিরোধী গণতন্ত্রের মন্ত্র জপেই চলেছে। যেমনটা আমাদের দেশে করে থাকে আওয়ামী-বিএনপি'র স্তাবকেরা। কিন্তু তাদের ব্যবস্থার গণবিরোধিতা, গণবিচ্ছিন্নতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সংকটকে তারা চাপা দিতে ও এড়িয়ে চলতে আর পারে না।

ভারত ছাড়া বাংলাদেশের আরেক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বার্মাতেও রোহিঙ্গা জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়ন মানবাধিকার বিরোধী অপরাধের সীমাও অতিক্রম করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শান্তিপুরস্কার প্রাপ্ত অং সান সুকীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এই জাতিগত নির্মূলীকরণের মধ্যযুগীয় অভিযানকে নগ্ন সমর্থন দিয়ে নিজের ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও শান্তির মুখোশ খুলে ধরছে। আর এই বর্বরতাকে হাসিনা-আওয়ামী সরকার জঘন্যভাবে সমর্থন জুগিয়ে চলছে নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগণকে সীমান্তেই আটকে দেয়ার মাধ্যমে এবং তাদের উপর চালিত বর্বরতাকে যুক্তিযুক্ত করার নামে। রোহিঙ্গা জনগণের এই নির্মম পরিস্থিতির সুযোগ নিতে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলো সক্রিয়

রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। *(হাসিনা সরকার গত বছরের রোহিঙ্গা সমস্যার সময় ঠিক এ পলিসিই গ্রহণ করেছিল। যা তারা ২৫ আগস্ট,'১৭-এ সূচিত সাম্প্রতিক শরণার্থী ঢলেও প্রথমাবস্থায় অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু বিশ্ব ও দেশীয় জনমতের চাপে এবং বিপুল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চরম অমানবিক বাস্তবতার চাপে সে তার পলিসি বদলাতে বাধ্য হয়েছে। তবে রোহিঙ্গা সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের ভারত-পন্থী ও আত্মসমর্পণবাদী নীতি একই রয়েছে– সিসি/সেপ্টেম্বর,'১৭)।*

দেশীয় পরিস্থিতি ঃ

এই সমগ্র বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরিস্থিতিই আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মূলতঃ গড়ে তুলছে। '৯০-সালে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন-ভারতের আশীর্বাদপুষ্ট মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফানুস ১৫ বছরেই ফেটে গিয়েছিল। যার সুযোগ নিয়েছিল সামরিক শাসকরা ২০০৭ সালে, যাতে আবার ঐ গণতন্ত্রের মুরুব্বি মার্কিন, ইইউ ও ভারতের যৌথ মদদ ও ষড়যন্ত্র ছিল। কিন্তু জনগণের তীব্র বিরোধিতায় ও সমগ্র শাসকশ্রেণির আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তারা পুনরায় মুৎসুদ্দি গণতন্ত্র, যা আসলে স্বৈরতন্ত্রেরই একটি বুর্জোয়া 'গণতান্ত্রিক' রূপ, সেই পুরনো মদটিকেই পরিবেশন শুরু করে। বিশ্ব ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এবার শিকে ছিঁড়ে আওয়ামী লীগের কপালে। আওয়ামী শাসকরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের প্রত্যক্ষ মদদে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য না করে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার মানসে একে একে ফ্যসিবাদী পদক্ষেপগুলো জোরদার করে তোলে। তারই ফলস্বরূপ ২০১৪ সালে একটি ভোটারবিহীন 'নির্বাচনে'র প্রহসন করে তারা এমনভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোন রকম সুযোগ সেখানে নেই। একে নিছক শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের ক্ষমতার লোভ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক প্রভুত্ব রক্ষায়, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ও শোষণ-লুণ্ঠন নিরংকুশ করায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ এই ব্যবস্থা। এর সাথে মেলবন্ধন ঘটেছে আওয়ামী লীগের মত পার্টির ফ্যাসিবাদী চরিত্র– যা প্রকাশ পায় '৭১-এর চেতনা, জাতির পিতা, শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী বিচার, ইতিহাস বিকৃতি আইন, বাঙালিত্বের জয়গান, জঙ্গি ও মৌলবাদ জুজু, মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিচার ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে দলীয় অধীনস্থ করা, প্রশাসন বিশেষত আর্মি ও পুলিশ এবং মাঝারী থেকে উচ্চ আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে দলীয় সংস্থায় পরিণত করার ফ্যাসিবাদী আদর্শগত-রাজনীতিকে বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

হাসিনা-আওয়ামী লীগকে নিরংকুশ মদদ দেয়ার প্রতিদানে তারা দেশের

উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য শোষণ ও হস্তক্ষেপকে অবাধ করে দিয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অব্যাহত রাখা, সীমান্তের অতি নিকটে সাতক্ষীরায় আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, সমুদ্র বন্দরগুলোকে ভারতের জন্য অবাধ করে দেয়া, দেশের ভিতর দিয়ে প্রায় বিনামূল্যে ভারতীয় ভারী মালামাল, এমনকি সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা পরিবহনের সুযোগ করে দেয়া, এমনকি সেজন্য নদী বন্ধ করে সড়ক নির্মাণ, তিস্তার পানি, টিপাই মুখ বাঁধ, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীগুলোকে হত্যার ষড়যন্ত্র বর্ধিতকরণ, সীমান্তে বেশুমার হত্যা, পোলট্রি ও ডেইরী শিল্পকে ভারতের স্বার্থের নিকট হুমকির মুখে ফেলা, বস্ত্র শিল্প বিশেষত বেনারসী শাড়ি ও অন্যান্য পরিধেয়র ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের বৈধ ও অবৈধ প্রবেশকে অবারিত করা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবাধ ভারতীয় আগ্রাসন বিশেষত ভারতীয় টিভির অবাধ প্রচার ও চলচ্চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, গার্মেন্ট শিল্পসহ বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়'র অবৈধ অবস্থান, বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমানোর জন্য গুম ও হত্যার ক্ষেত্রে সরাসরি ভারতীয় বাহিনীগুলোর অনুপ্রবেশকারী সুযোগ দান, সন্ত্রাস দমনের নামে ভারতীয় গোয়েন্দা ও সেনা তৎপরতার ষড়যন্ত্র চালানো– ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে, এবং আরো বহুবিধ গোপন উপায়ে (যেমন, প্রতিরক্ষা চুক্তির ষড়যন্ত্র) তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের কাছে দেশের সার্বভৌমত্বকে তুলে দিয়েছে।

গণতন্ত্রের (বুর্জোয়া) বিকল্প হিসেবে হাসিনা-আওয়ামী লীগ উন্নয়নের গলাবাজি করছে। তারা নির্লজ্জভাবে স্লোগান তুলেছে "শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র, উন্নয়নের গণতন্ত্র"। এভাবে তারা তাদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভড়ং-কেও প্রকাশ্যে নির্বাসনে দিয়েছে। ইতিহাসে সকল শাসকশ্রেণিরই নিজস্ব উন্নয়ন ভাবনা ও পরিকল্পনা ছিল ও রয়েছে। প্রশ্ন হলো উন্নয়নের শ্রেণিচরিত্রটা কী? উন্নয়ন কীসের জন্য, কার জন্য, কীসের বিনিময়ে? হাসিনা-আওয়ামী সরকারের উন্নয়নের অর্থ হলো ফ্যাসিবাদ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের সমস্ত লুণ্ঠনকে এবং নিজেদের গোষ্ঠীগত লুটপাট দুর্নীতি অর্থপাচার ও তীব্র শোষণকে সম্পূর্ণ বাধামুক্ত করা। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের স্বার্থে ও পরিকল্পনায় বড় বড় তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রজেক্টের দ্বারা তাদের সার্টিফিকেট নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিজেরা তার থেকে কমিশন লাভ (যেমন, রামপাল, রূপপুর, পদ্মা সেতু, উড়াল সড়ক, মেট্রো রেল, সড়ক যোগাযোগ, রেন্টাল বিদ্যুত, সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি)। এবং রয়েছে তাদের অধীনস্ত শিল্প (বিশেষত গার্মেন্টস) ও জনশক্তি রফতানীর মুৎসুদ্দি বিকাশ। এর সাথে শেয়ার বাজার ও ব্যাংক লুটও রয়েছে, রয়েছে বড় বড় চোরাকারবার, মাদক ব্যবসা, নারী ও আদম পাচার, ভূমিদস্যুতা, নদী খাল বিল জলা ও বন খেকোর পরিবেশ ধ্বংসকারী অপতৎপরতা, নির্বাচনে ও পার্টির পদায়নে মনোনয়ন বাণিজ্য প্রভৃতি। নিচুস্তরে এদেরকে টিকিয়ে রেখেছে ঘাসমূল পর্যন্ত আওয়ামী সন্ত্রাসীদের এক বিস্তৃত জাল, যারা চাঁদাবাজী দখলবাজী টেন্ডারবাজী লুটপাট

ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দ্বারা পুষ্ট, স্বার্থায়িত, এবং এ কারণেই উপরের স্তরের অন্ধ অনুগত ও ফ্যাসিস্ট লাঠিয়াল।

এই অর্থনীতি ও রাজনীতি আমাদের দেশের তিনটি মূল সম্পদ জন, জল আর জমিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই ব্যবস্থা বেকারত্বকে এত বিপুল মাত্রায় বিকশিত করেছে যে, দেশের বিপুল জনশক্তিকে তারা দেশজ উৎপাদন ও দেশের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে বিদেশে পাচার করে তার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে ফুটানি করছে। এভাবে তারা উন্নয়ন ও জনকল্যাণের সবচেয়ে বড় সম্পদ জনশক্তিকে ধ্বংস করছে।

এই ব্যবস্থা দেশের মূল্যবান সম্পদ জল ও জমিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা ঐতিহ্যবাহী কৃষির সর্বনাশ করেছে, কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে দেশের জাতীয় শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষির জন্য শিল্পের প্রয়োজনে কাজে না লাগিয়ে বিদেশে পাচার করছে। তা করার প্রক্রিয়াতে দুর্নীতি ও নির্মম উপায়ে কৃষি-নির্ভর তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার তাদেরই কষ্টে অর্জিত রেমিটেন্সের গলাবাজী করছে। বিদেশে শ্রমশক্তি পাচারের অর্থনীতির কারণে এমনকি কৃষিতেও প্রয়োজনীয় সময়ে মজুর ঘাটতি হচ্ছে। আর বিদেশ থেকে আসা অর্থ কোনো উৎপাদনমুখী জাতীয় শিল্প বা কৃষির উন্নয়নে ব্যয় না হয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগ-বিলাসে, কৃষি ও গ্রাম ছেড়ে নগরে চলে যাওয়ায়। ফলত এক দমবন্ধকর নগরায়নের বিষে সমগ্র সমাজ ও নগর জীবন কলুষিত হচ্ছে।

এই মুৎসুদ্দি-সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়ন পরিবেশের ধ্বংস সাধন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সর্বনাশা কর্মকাণ্ডেরই অংশমাত্র। যদিও এর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশবাদী বুর্জোয়া আন্দোলন কিছু মাত্রায় গড়ে উঠেছে, কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস রোখার ক্ষেত্রে তা সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারছে। কারণ, এই বিশ্ব ব্যবস্থা, এবং তারই অধীনস্ত দেশীয় মুৎসুদ্দি উন্নয়নের অর্থনীতি-রাজনীতিকে সমূলে উচ্ছেদ না করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাতে বিশ্ব যেমন পরিবেশ বিনাশী ধ্বংস ও বহুবিধ বিপর্যয় থেকে রক্ষা হবে না, তেমনি দেশের ক্ষেত্রেও তা মারাত্মক সব পরিণতি ডেকে আনছে ও আনবে। এসব কিছুকে আড়াল করা ও গোপন করার জন্যই তারা আরো বেশি বেশি করে উন্নয়নের গলাবাজী করছে।

কৃষিতে হাইব্রিড ও জিএমসহ সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তি বাছবিচারহীনভাবে প্রয়োগ ক'রে, ভূগর্ভস্থ পানি অপরিণামদর্শীর মতো ব্যবহার ও অপব্যবহার করে, কীটনাশক ও কেমিক্যালের মরণঘাতি ব্যবহার করে, যত্রতত্র কৃষি জমি ধ্বংস করে জলাভূমির সর্বনাশ করে শিল্প ও বাসস্থানের জন্য জমি গ্রাস করে, নদী খাল বিল পুকুর ধ্বংস করে, বায়ুদূষণ ঘটিয়ে পরিবেশের অপরিমেয় ক্ষতি করে চলেছে। আর একাজে সাম্রাজ্যবাদীদের সেবার পুরস্কার স্বরূপ তারাই আবার পরিবেশ পুরস্কার পাচ্ছে ও

সেটা তারা সাড়ম্বরে প্রচার করছে নির্লজ্জের মতো। (রাজধানী ঢাকা বাস্তবে বিশ্বের ১ নম্বর বসবাস অযোগ্য নগর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আসলে ঢাকা রয়েছে ২ নম্বরে, আর ১ নম্বরে রয়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক– যে নগরটি যুদ্ধবিধ্বস্ত, এবং যার সাথে ঢাকার তুলনা করাটা হাস্যকর)।

একদিকে উন্নয়নের নামে ঐতিহ্যবাহী কৃষির এই সংকট, অন্যদিকে কৃষি মৎস্য ও কুটির শিল্পে এখনো বর্গা, সুদী কারবার, ইজারা, দাদন– এইসব সামন্ততান্ত্রিক শোষণগুলো অব্যাহত রয়েছে। কৃষি ও কৃষক রয়ে গেছে প্রধানত ক্ষুদে মালিকানাধীন ও ক্ষুদে উৎপাদক। সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তি ও পণ্যের বিপননের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে গলাবাজী শাসকেরা করে থাকে সেটা বর্তমান বিশ্বে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির বিরাট উন্নয়নের যুগে একান্তই হাস্যকর। সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী মৎস্য উৎপাদন ও ফলের উৎপাদনকে ধ্বংস করে দিয়ে স্বল্পজমির এই দেশে স্বর্ণতুল্য উর্বর কৃষি জমিকে বাছবিচারহীনভাবে মৎস্য খামার ও ফলবাগান বানানোর আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়া হয়েছে। রফতানীমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইপিজেড, এসইজেড/সেজ (SEZ)– ইত্যাদির মাধ্যমে রফতানীমুখী জাতীয় শিল্পবিরোধী তথাকথিত শিল্পায়নের মাধ্যমে মহামূল্যবান কৃষি জমিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বিপরীতে জাতীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদনকে ধ্বংস করা হচ্ছে। শুধু ধান চাল উৎপাদনকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে মিথ্যা প্রচার দেয়া হচ্ছে; অথচ অন্য বহু খাদ্য সামগ্রী– যেমন, ডাল, তেল, পিঁয়াজ, মশলা, চিনি, দুধ– এসবকে করে তোলা হয়েছে আমদানী নির্ভর। এমনকি ডিম, মাংস, মাছ– এসবের ক্ষেত্রেও সমগ্র জনগণের প্রকৃত খাদ্য চাহিদার চেয়ে বহু নিচে রয়ে গেছে উৎপাদন। অন্যদিকে ধান, ফল, সব্জী উৎপাদন করে কৃষক লাভবান হতে পারছেন না। কৃষি পণ্যের সংরক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব, মৌসুমে দাম না পাওয়া, পরিবহনে পুলিশ ও সরকারি মাস্তানদের চাঁদাবাজি– এসবের কারণে কৃষক একবার এই পণ্য, আরেকবার ঐ পণ্য– এভাবে উৎপাদনে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝেই বড় ক্ষতির মুখে পড়ছেন।

এসবকেই রক্ষার জন্য কায়েম করা হয়েছে ফ্যাসিবাদ। নিত্য নতুন কালা-কানুন (যেমন, তথ্য-প্রযুক্তি আইন), বিদেশের সাথে বিশেষত ভারতের সাথে গোপন চুক্তি, মাঠের সমস্ত প্রতিবাদের নির্মম দমন, কণ্ঠরোধ, গুম, হত্যা, ক্রসফায়ার, মামলা-হামলা, কণ্ঠরোধ এবং নির্বাচনের নামে প্রহসন। এ কারণে শাসক শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব যেকোন ইস্যুতেই প্রায় অমীমাংসেয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকেও কঠোর বলপ্রয়োগে দমনের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবশেষটুকুও শেষ করে দিচ্ছে। যুদ্ধাপরাধী বিচারের ন্যায্য দাবিকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূলের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছে। যা আবার শাসকশ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরো বৃদ্ধি করেছে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাদের সাথে যতই

দহরম মহরম করুক না কেন হেফাজতের আন্দোলনকে তারা বর্বর কায়দায় দমন করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি'র সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজী হয়েছে। এসবই শাসকশ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্বকে সীমাহীন মাত্রায় বিকশিত করেছে। যারই বহিপ্রকাশ দেখা যায় ২০১৫ সালে বিএনপি'র আন্দোলন দমনে যা কিছু উপায় রয়েছে তা প্রয়োগের মাধ্যমে। এতে উভয় পক্ষই জনগণকে পেট্রোল বোমার মাধ্যমে বর্বরোচিত কায়দায় হত্যা করে, তাদেরকে জিম্মি করে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছে এবং এ মধ্যযুগীয় বর্বরতার জন্য একে অন্যকে দায়ী করে চলেছে। তারা বুর্জোয়া নির্বাচনী ব্যবস্থাকেও এ ফ্যাসিবাদী শাসনকে অব্যাহত রাখার কারণেই এবং এ উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা এই ফ্যাসিবাদকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত চালিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই তারা প্রকাশ্যে বলা শুরু করেছে যে, ২০১৯ সালে হাসিনা মার্কা নির্বাচনেই সবাইকে যেতে হবে, তাতে তারাই জিতবে, এমনকি ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তারাই জিতবে।

* শাসকশ্রেণির বিভিন্ন দ্বন্দ্বমান গোষ্ঠীর সাথে বৈদেশিক সম্পর্কের বড় ধরনের পরিবর্তন ও তাদের হস্তক্ষেপ, অথবা শাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে গুরুতর/বলপ্রয়োগ-জাত (প্রকাশ্যে বা পর্দার আড়ালে) কোন বদল না ঘটলে নির্বাচনী পদক্ষেপের দ্বারা এর আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। বিএনপি'র মত শাসক শ্রেণির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বটে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আওয়ামী শাসকরাও বিদেশী আশীর্বাদ, বিশেষত ভারতীয় মদদকে নিরংকুশ রাখতে মরিয়া হয়েই সচেষ্ট রয়েছে। সুতরাং আগামীতে বুর্জোয়া রাজনীতিতেও বলপ্রয়োগ, রক্তারক্তি, বৈরিতা এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ যে আরো বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদের সকল পক্ষই মৌলবাদী জঙ্গি তৎপরতাকে নিজেদের অপরাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছে। এবং তাকে ইস্যু করে সরকার ও রাষ্ট্র জনগণের উপর আক্রমণ, দমন, হয়রানি ও ফ্যাসিকরণকে শক্তিশালী করছে। গণমুখী কোন রাজনীতি এ পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে শক্তিশালী হওয়ার আশু কোন সম্ভাবনা নেই। বিবিধ স্থানীয় নির্বাচনে তথাকথিত বামদের ফলাফল এবং মাঠের আন্দোলনে তাদের রেকর্ড এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। জনগণের হিংসাত্মক সংগ্রাম এবং সে অনুযায়ী গোপন বিপ্লবী সংগঠনই এর একমাত্র ইতিবাচক বিকল্প। যদিও সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিকূলতা বিদ্যমান। বিপ্লবী সংগঠন ও সংগ্রামের বিকাশ খুবই কঠিন ও বিপদসংকুল হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিকূলতার পাহাড় কেটে এগিয়ে চলার মাঝেই গণরাজনীতির সফলতা নির্ভর করছে। তার বস্তুগত ভিত্তিও রয়েছে। জনগণ প্রচলিত বুর্জোয়া নির্বাচনী রাজ-নীতির উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন, শুধুমাত্র দলীয় সুবিধাপ্রাপ্ত কেডার ও মাথা-বিক্রি বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া কেউ এদের পক্ষে নেই। যদিও জনগণ আবার ভোটের সুযোগ হলে তাদেরকেই ভোট দেন, কারণ, এই আফিমে তারা আসক্ত হয়ে গেছেন। অবশ্য

ভোট দিয়ে আবার তারা প্রতারিত হন, এবং সেটা বুঝতেও তাদের খুব একটা সময় লাগে না। ভোট, যদি হয়ও, তাতে জনগণ তাদের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করেন না। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় ফ্যাসিস্ট নিপীড়ন, লুটপাট ও নির্মম শোষণে জনগণ অতিষ্ঠ। কিন্তু শুধু অনাস্থা থেকেই কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে না, যার উদাহরণ সাম্প্রতিককালে আমরা 'আরব বসন্তের' ক্ষেত্রে দেখেছি। ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী আদর্শ, কর্মসূচি, পার্টি ও সংগ্রাম। তার উপরই আন্তরিক বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী মানুষকে জোর দিতে হবে, সেজন্য ত্যাগের ও সংগ্রামের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

* অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি, মধ্যম আয়ের দেশ, রেকর্ড রিজার্ভ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা– এসব নিয়ে শাসকশ্রেণি, বিশেষত আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা গলাবাজীতে সোচ্চার। কিন্তু এসবের অন্তর্নিহিত ফাঁপা পরিস্থিতি খুব একটা অস্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ লুটের ঘটনার পর খোদ অর্থমন্ত্রী পরিস্কার করে দিয়েছে যে, রিজার্ভ বৃদ্ধির সাথে ব্যাংক পরিচালনার যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। এর অর্থ হলো এর কোন কৃতিত্ব সরকারের নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে হয়েছে বিদেশের চরম বৈরী পরিবেশে, পরিবার পরিজন বিহীনভাবে, মধ্যযুগীয় পরিশ্রম অপমান ও লাঞ্ছণার মাঝে দেশের প্রবাসী শ্রমিকদের অপরিমেয় কষ্টের বিনিময়ে। কিন্তু যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এ বিপুল অর্থ দেশের জাতীয় শিল্পের বিকাশে কোন অবদান রাখতে পারছে না। রাষ্ট্রের ও সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ তোষণ ও দালালীর কারণে এত দেশীয় অর্থ থাকতেও বিদেশীদের জন্য অসংখ্য ইপিজেড বানানো হচ্ছে। বড় বড় প্রজেক্টে বিদেশী অর্থ, পণ্য ও বিশেষজ্ঞ কাজে লাগানো হচ্ছে। ভারতের থেকে মাত্র ২০০ কোটি ডলার ঋণ আনা হচ্ছে বন্ধুত্ব দেখানোর জন্য বহু দেশবিরোধী শর্তে। একইভাবে করা হয়েছে ৫০০ কোটি ডলার ঋণের অস্ত্র-চুক্তি। অথচ ব্যাংকে পড়ে রয়েছে প্রায় ৩,০০০ কোটি ডলার, যা এখন লুটপাটকারীদের ডিজিটাল ডাকাতির খোরাক হয়েছে। এই দেশবিরোধী প্রক্রিয়াকে আরো বর্ধিত করার লক্ষ থেকে হাসিনা সরকার ১০০টি এসইজেড নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। এই পরিকল্পনা দেশের অতিমূল্যবান জমি, জ্বালানি ও সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদী/বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া, দেশের শ্রম-শক্তিকে বিদেশী পুঁজির অতি-শোষণের কবলে নেয়া এবং এসবের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী/বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মোটা অংকের কমিশন নিয়ে তা বিদেশে পাচার করার দেশ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী দালালী প্রকল্প ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলে আরো আরো কৃষক তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন, পরিবেশের এক ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটবে, দেশের স্বল্প গ্যাস ও জ্বালানি সম্পদকে বিদেশী পুঁজির সেবায় উৎসর্গ করা হবে।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটি বদমাইশী হিসাব

ব্যতীত কিছু নয়। প্রবাসী আয় এবং গার্মেন্ট শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ, বিশেষত নারীর কর্মসংস্থান দেশে অর্থের প্রবাহকে বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। যার প্রভাব দেখা যায় ভোগ্য সামগ্রীর বাজার বৃদ্ধি, নির্মাণ কাজের বিকাশ এসবের মাঝে। কিন্তু যে বিষয়টা লুকিয়ে রাখা হয় তাহলো, জনগণের, শ্রমিক কৃষকের শ্রমের অর্থ কীভাবে ও কত ব্যাপক পরিমাণে শোষিত হচ্ছে শাসক বুর্জোয়াদের দ্বারা– সেই সত্যটি। বলা হয়ে থাকে গড় আয় বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যম আয়ের দিকে যাচ্ছে দেশ। এটা তো জ্বলজ্যান্ত ঘটনা যে একজন কৃষক বা শ্রমিক বা সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান দশগুণ বাড়েনি। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, টঙ্গী অঞ্চলের একজন শ্রমিকের প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মান পাকিস্তান আমলে '৬০-এর দশকের শেষে যা ছিল, তার তুলনায় বিগত ৫০ বছরে শিল্প শ্রমিকের আয় কমই বেড়েছে। এমনকি দ্বিগুণও হয়নি। কোন কোন হিসেব বলে যে, এ আয় কমেছে। অথচ গড় আয় দেশের বেড়েছে ১০ গুণের বেশি। এর অর্থ হলো, অল্প সংখ্যক কোটিপতির আয় বহু বহু গুণ বেড়ে গেছে এবং বৈষম্য বেড়েছে পাকিস্তান আমলের চেয়েও আরো বহুগুণ। সুতরাং গড় আয় বৃদ্ধির হিসেব শাসকদের লুকানো বিপুল সমৃদ্ধিরই অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ। লুটপাট ও অবিশ্বাস্য শোষণের দ্বারা অর্জিত এই বিশাল পরিমাণ অর্থের একটা বিরাট অংশ তারা বিদেশে পাচার করছে, বিদেশে তারা বিলাসবহুল বাড়ি ঘর তৈরি করছে, ব্যবসা চালাচ্ছে, ব্যাংকে জমা রাখছে। গত ১০ বছরে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে বলে তাদেরই বিভিন্ন সংস্থা জানাচ্ছে। এর তুলনায় জনগণের বিশেষ কোন সমৃদ্ধি তো ঘটেইনি, বরং তারা পেটে শুধু ভাত পেয়ে আরো হাজারো রকমের নতুন সংকটে ও নতুনতর বঞ্চণার মাঝে পড়েছেন।

– নগরের শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষেরা বাড়ীভাড়া ও বাড়ীওয়ালাদের অত্যাচার, পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলীয় মাস্তানদের চাঁদাবাজী দখলবাজী ও নিপীড়ন, মানবেতর পরিবেশে শ্রম ও বাসস্থানের মানবেতর পরিবেশ, অল্প মজুরি, বাধ্যতামূলক ওভার-টাইম, বেতন আটকে রাখা, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, ছাঁটাই আতঙ্ক, বেকারত্বের ভীতি, দ্রব্যমূল্যের নিয়মিত বৃদ্ধির যাঁতাকলে জর্জরিত। তাদের অধিকাংশের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। সবচেয়ে আলোচিত গার্মেন্ট শিল্পে বিশ্বের সর্বনিম্ন নারী-মজুরি বিরাজমান। অথচ শাসকশ্রেণি, তার বর্তমান সরকারি প্রতিনিধি শেখ হাসিনা গার্মেন্ট শিল্পের নারী শ্রমিকদের মুক্তির জয়গানে বিভোর। রানা প্লাজা, তাজরিন, টাম্পাকো'র মতো মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞকে নিছক 'দুর্ঘটনা' বলে চালানোর প্রচেষ্টা চলছে। এসব আলোচিত ঘটনা ছাড়াও প্রতিনিয়ত বহু শিল্প দুর্ঘটনায় প্রতি বছর অসংখ্য শ্রমিক ও জনগণ নিহত হচ্ছেন, পঙ্গু হয়ে পড়ছেন, এমনকি নিম্নতম চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিহ হচ্ছেন। ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা। অসংখ্য শিশু শ্রমিক বিভিন্ন শ্রমক্ষেত্রে প্রায় পেটেভাবে নিয়োজিত। যে বিদেশ-নির্ভর শিল্প ও আমদানী-রফতানী নির্ভর অর্থনীতি শাসক বুর্জোয়া শ্রেণিটি গড়ে তুলেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র করার সুযোগ যেমন বৃদ্ধি

পেয়েছে, তেমনি যেকোন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলোর সংকট আছড়ে পড়তে পারে দেশের এইসব পরগাছা শিল্পের উপর। ধর্মবাদী জঙ্গিদের একটিমাত্র বড় এ্যাকশনে (গুলশান) তাদের রেস্তোরাঁ, পর্যটন, এমনকি গার্মেন্ট শিল্প পর্যন্ত হুমকির মুখে পড়েছিল। এথেকেই বোঝা যায় যে, এই ধরনের উন্নয়ন-ধারায় জনগণের, এবং দেশের ভবিষ্যত কতটা অনিশ্চিত। শুধু নিশ্চিত হলো শাসকশ্রেণি ও সরকারি দলীয় নেতা ও কেডারদের বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া। প্রবাসী শ্রমিকেরা বছরের পর বছর পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন। বিদেশে যেতে গিয়ে জমি-জমা বিক্রি করে নিঃস্ব হওয়া ও সমুদ্রে লাশ হয়ে নিখোঁজ হওয়ার পরিণতি ছাড়াও নারীদেরকে পাচার ও যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে।

মধ্যবিত্ত জনগণও শহরে বাসস্থানের ঘোরতর সমস্যায় জর্জরিত। তারা দ্রব্যমূল্যের জাঁতাকলে পিষ্ট। তাদের সন্তানরা বেকারত্বের ভীতিতে আক্রান্ত। এর উপরে তাদের উপর রয়েছে মাদকের ছোবল, যার আসল যোগানদাতা ও ব্যবসাদার হলো শাসকশ্রেণির দলীয় নেতা, মাস্তান কেডার, পুলিশ, বিজিবি ও আর্মী। মৌলবাদ জুজুর ভয় দেখিয়ে ও এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে বিশেষত তরুণ ও ছাত্রদের উপর বর্ধিত নজরদারি, নিপীড়ন জারি করা হয়েছে। তরুণ-ছাত্র-ব্যাচেলরদের মেসগুলোতে যখন তখন হানা দেয়ার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা-শিক্ষাকে অতিষ্ঠ ও অসম্ভব করে তুলেছে এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ ও কথা বলার মতো কোন বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া, সুশীল নেই।

– শিক্ষা ও চিকিৎসা এখন দিন দিন দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। এর মূল কারণ হলো এগুলোর বাণিজ্যিকরণ ও তার মাধ্যমে শাসকশ্রেণি ও সুবিধাভোগী শ্রেণির বিপুল অর্থ লুটের ব্যবস্থা।

শিক্ষার হার বাড়িয়ে দেখিয়ে বাহ্বা পাওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। এরসাথে যুক্ত হয়েছে সিলেবাসের আওয়ামী করণের মাধ্যমে ইতিহাসবিকৃতির এক নজীরবিহীন অভিযান। 'মুক্তিযুদ্ধে'র চেতনা ও তথাকথিত জাতির পিতার নামে তারা মিথ্যা ইতিহাস ও ব্যক্তিপূজার যে অশ্লীল চর্চা চাপিয়ে দিয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর তার সাথে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিজীবী নামের এক শ্রেণির স্তাবক। যার ফলে শিক্ষার মানে এক চরম অবনতি ঘটেছে। উগ্রজাতীয়তাবাদের বিষ দ্বারা ও বিকৃত ইতিহাস দ্বারা কলুষিত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে শিক্ষা-সংকোচনের বিবিধ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কৃষক শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের সন্তানদের জন্য শিক্ষাকে কঠিন করে তোলার জন্য শিক্ষা-সংকোচনের অংশ হিসেবে প্রাইমারিকে অষ্টম শ্রেণি ও মাধ্যমিককে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত করার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। একইসাথে ডিগ্রিকে চার বছর করার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষাকেও সাধারণ জনগণের কাছে কঠিন করে তোলা হয়েছে। বিনামূল্যে

মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকের স্লোগানের আড়ালে বাস্তবে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাও খুবই ব্যয়সাধ্য করে তোলা হয়েছে। কোচিং, প্রাইভেট, গাইড বই, ইউনিফর্ম, বিভিন্ন ফি-এর নামে যেকোন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের খরচ পাকিস্তানী আমলের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বিনামূল্যে বই সরবরাহের নামে বিশাল অংকের বাজেটের পুস্তক প্রকাশের বড় অংশকে ভারতীয় প্রকাশকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এভাবে দেশীয় মুদ্রণ শিল্পের উপরও আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বাজেটের প্রচারের আড়ালে গোপন করা হয় এই সত্যটি যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষা-বাজেটের এক-তৃতীয়াংশও এদেশে বরাদ্দ হয় না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে এবং এভাবে সাধারণ জনগণের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এক বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলগুলোতেও সরকারি ছাত্র-সন্ত্রাসী ও শিক্ষক-নেতাদের ভর্তি বাণিজ্য এখন এক ওপেন সিক্রেট।

তিন ধারার শিক্ষা– যথা বাংলা, ইংরেজী ও মাদ্রাসা– বহাল রাখার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সূচনাতেই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে সরকারি-বেসরকারি, ক্যাডেট, 'ভাল বিদ্যায়তন' ইত্যাদি প্রকারে বৈষম্য। এ বৈষম্য এখন পাকিস্তানী আমলের চেয়ে বহুগুণ বেশি। ধর্মীয় শিক্ষা ও লেবাস মাদ্রাসা ছাড়িয়ে এখন 'আধুনিক' বিদ্যালয়গুলোতে প্রসার ঘটেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে সহশিক্ষাকে বাতিল করা হচ্ছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা নিম্নস্তরের বলে বিবেচিত হচ্ছে। এসবই একদিকে শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ জনগণের থেকে শিক্ষাকে দূরে নিয়ে গেছে, শিক্ষার্থীদের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অপসংস্কৃতি ও চেতনায় কলুষিত করছে, অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদী পশ্চাদপদতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি আধুনিক তরুণীদের মাঝেও হিজাব, বোরখার ব্যাপক প্রচলন গড়ে উঠছে।

– চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরাট বিকাশের এই যুগেও দেশের সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিরোধযোগ্য রোগের চিকিৎসা এখনো অধরা। চিকিৎসার বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে যত্রতত্র ক্লিনিক, হাসপাতালের ছড়াছড়ি। একদিকে এগুলো প্রধান নগর-শহরগুলোতে কেন্দ্রীভূত। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও নগর-প্রান্তের শ্রমজীবী-দরিদ্র এলাকাগুলো এথেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে উচ্চমূল্যের ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থার শিকার রোগাক্রান্ত জনগণ। চিকিৎসাকে সেবার বদলে এক অসৎ বাণিজ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর এতটাই অবনতি ঘটেছে যে, ডাক্তারদের একটা বড় অংশ ঔষধ-কোম্পানি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কমিশনভোগী হিসেবে তাদের এজেন্টে পরিণত হয়েছে। এমনকি এদের সাথে সরকারি আমলা নেতা পুলিশের যোগসাজশে জীবন রক্ষাকারী ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল হচ্ছে। নিছক

মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অপ্রয়োজনীয় অপারেশন, বিশেষত সিজারিয়ান ডেলিভারি, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপ্রয়োজনীয় ঔষধ– ইত্যাদির চাপ ও রেওয়াজ এতটাই বেড়েছে যে, সাধারণ জনগণের চিকিৎসা আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। জমি-জমা বিক্রি করে ব্যয়বহুল চিকিৎসার মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র মানুষ মৃত্যুর আগে ডাক্তার ও হাসপাতালগুলোর পকেট ভারী করে নিঃস্ব মানুষে পরিণত হওয়ার একটা বর্বর ব্যবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। নারীর গর্ভপাতের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাধাকে বজায় রাখার ফলে বহু নারীকে অপচিকিৎসার আশ্রয় নিতে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে, অথবা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। পাশাপাশি ডাক্তার ও ক্লিনিকগুলোর মুনাফা শিকারের ফাঁদে পড়তে হচ্ছে।

– গ্রাম-শহরে নারীদের উপর নিপীড়ন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বর্বর রূপ নিচ্ছে। নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন বর্বরতার সীমা অতিক্রম করেছে। গাড়ি, বাড়ি, অফিস, শিক্ষায়তন, ক্যান্টনমেন্ট– কোথাও নারী আজ নিরাপদ নন। ধর্ষণ আজ সর্বব্যাপক রূপ নিয়েছে। তনু ধর্ষণ ও হত্যার বিচার না হওয়াটা ক্ষমতাশালীদের জন্য অবাধে এই সব নারী-নিপীড়ন চালানোর একটি সিগনাল। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিশুদের উপর বর্বর উপায়ে দৈহিক নির্যাতন ও হত্যা। এইসব নির্যাতনে বর্ধিত মাত্রা যুক্ত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুকে নারীর অবমাননাকর ছবি ও ভিডিও পোস্টের নতুন ধারা। নারীর অধিকার নিয়ে বড় বড় সরকারি ভাষণের আড়ালে হাসিনা-আওয়ামী লীগ মোল্লাদের ধমকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নটিকে মাটিচাপা দিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারীর বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে বাল্য বিবাহের সুযোগ দানের মাধ্যমে আরেকটি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এভাবে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরকে পক্ষে টানার কূটকৌশল নেয়া হয়েছে ও তাদের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। একইসাথে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নামে পুলিশ কর্তৃক জনগণকে হয়রানি করা, ঘুষ খাওয়া, নিপীড়ন করা, কেস দেয়া– ইত্যাদির মওকা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে জনগণ এক বর্ধিত ভোগান্তির কবলে পড়েছেন। যৌতুককে আইনীভাবে যতই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক না কেন, বাস্তবে বহু নারী এই যৌতুকের কারণে জীবন দিচ্ছেন, অসংখ্য নারীকে তালাকের মুখে পড়তে হচ্ছে, আর সাধারণভাবেই প্রায় সকল নারীকে এ কারণে নিগৃহীত লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীকে চার দশক ধরে এই রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি কোন রকম মানবগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে এখন তাদেরকে "তৃতীয় লিঙ্গ" হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও বাস্তব জীবনে তাদের কোন রকম পুনর্বাসন ও সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করেনি। এভাবে তারা এই অবহেলিত ও নিন্দিত জীবনের জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবনেই রেখে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে তারা লজ্জাজনক উপায়ে, এমনকি জোর করে অর্থ

আদায়ের পথে চলছে, অনেককে অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

সমকামীদের অধিকারের প্রশ্নটি এদেশে এতটাই উপেক্ষিত যে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় তাদেরকে হত্যা করার সুযোগ মৌলবাদীরা আজ পেয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি এক্ষেত্রে মূলত মৌলবাদী অজ্ঞানতা ও ফ্যাসিবাদকেই মদদ দিয়ে চলেছে।

হিজড়া ও সমকামীদের সমস্যাগুলো নারী-প্রশ্নের সাথে যুক্ত সমস্যা। এই রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি তার পুরুষতান্ত্রিক নারী-বিরোধী অবস্থানের কারণেই এই দুই বিষয়েও চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা চালিত হচ্ছে।

– এই সমাজ-ব্যবস্থা, শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র তরুণদের বিরাজনীতিকরণকে নিজেদের ক্ষমতার জন্য একটি প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। তারা জানে যে, ব্যাপক জনগণ ও তরুণ সমাজ তাদের রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একে মোকাবেলার জন্য হাসিনা সরকার '৭১-এর চেতনার নামে ইতিহাস বিকৃতির এক চরম অনৈতিক পথে নেমেছে। তারা '৭১-সালে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণবাদী সুবিধাবাবাদী ও পলায়নবাদী ভূমিকাকে, এবং ভারতের নগ্ন দালালীকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছে শিশু ও তরুণদের কাছে। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ না হওয়ায় তারা তরুণদের নৈতিক অধঃপতনের পথে চালিত করছে। তরুণরা মাদক, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মোবাইল, কম্পিউটার, পর্ণো, ক্রিকেটে আসক্ত। এই বিরাজনীতিকরণেরই একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো তাদের একটা অংশের ধর্মবাদী জঙ্গি কার্যক্রমে ঝুঁকে পড়া। আবার একে ব্যবহার করে শাসকরা তরুণদের উপর আক্রমণ, হয়রানি এতটাই বৃদ্ধি করেছে যে, তাদের পক্ষে পড়াশুনা চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে।

– এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুদেরকে নিজ বাসভূমে পরবাসী করার ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সাংবিধানিকভাবে তাদেরসহ সকল আদিবাসী জনগণের আদিবাসী ও পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রাণের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সামরিক বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট করা হচ্ছে। পাহাড়ী অঞ্চলে জোর করে বাঙালি পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিজ ভূমিতে পাহাড়ী জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চল কার্যত সামরিক শাসনের জাঁতাকলে রাখা হয়েছে। সামরিক বুটের জোরে পাহাড়ী জনগণের ভূমির উপর ঐতিহ্যগত অধিকারকে হরণ করা হয়েছে এবং "দলিল নেই" অজুহাতে তাদের ন্যায্য ভোগদখলের জমি-জঙ্গল-পাহাড়গুলোকে বড় বড় বাঙালি ব্যবসায়ী-আমলাদের মালিকানায় দিয়ে পাহাড়ী জনগণকে ভূমিচ্যুত করা হয়েছে। নিম্নতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে এবং নারী ও তরুণসহ সমগ্র জনগণের উপর হত্যা-ধর্ষণ-গুম-

শারীরিক নিপীড়নের মাধ্যমে তাদেরকে বর্বরভাবে দমন করা হচ্ছে।

পাশাপাশি সাঁওতাল, ওরাও, গারোসহ বিবিধ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলার পুরনো ষড়যন্ত্র নবায়িত করেছে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। তাদেরকে নিম্নবর্গের মানুষের মত করে অচ্ছ্যুত করা, তাদের ভূমি দখল, নারীদের উপর নিপীড়নসহ অবহেলিত অবস্থা অব্যাহতই রয়েছে। এরই প্রকাশ ঘটেছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী সন্ত্রাসী, পুলিশ ও আমলাদের মদদে সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগানো ও বর্বর উচ্ছেদ অভিযান চালানোর মধ্যে। এই ধারা অব্যাহতভাবে চলছে। আদিবাসী কৃষককে ভূমি থেকে উচ্ছেদ চলছে, আদিবাসী তরুণীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

– ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের উপর চলমান অব্যাহত অন্যায় অবিচার হুমকি ছাড়াও যে কোন অজুহাতে আক্রমণ ও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে মাঝে মাঝেই। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ও তার আগে রামুতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের উপর বর্বর আক্রমণ আওয়ামী 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভণ্ড রাজনীতির মুখোশ খুলে ধরেছে।

– বিহারী নামে পরিচিত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মানবেতর জীবনের পাশাপাশি তাদের উপর নিপীড়নে 'রাজাকার' অভিধা ব্যবহার করে যে ফ্যাসিবাদী আবহ তৈরি করা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী-এমপি'র প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মিরপুরে ১০ জন বিহারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়ার পর এখন তাদের নরকসদৃশ ক্যাম্পগুলো থেকেও উচ্ছেদ করে তাদের বাসস্থান ও জমি দখল করার গভীর ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল।

– একদিকে সামন্তবাদী সংস্কৃতির প্রভাব, আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী নারীবিরোধী সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া তরুণ সমাজের মাঝে এক বড় অবক্ষয় গড়ে তুলেছে। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতার পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের মাঝে বুর্জোয়া ট্রেডইউনিয়নবাদী রাজনীতি এবং ছাত্র-রাজনীতি এখন শাসক শ্রেণি, বিশেষত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের অধীনে মাস্তানবাজী টেন্ডারবাজী ও চাঁদাবাজীতে পরিণত হয়েছে। এসবের ফলশ্রুতিতে আওয়ামী মাস্তান ও দলীয় পুলিশের যোগসাজশ এই নিপীড়ন বৃদ্ধির এক বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি একদিকে মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদতাকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে পেলে পুষে বড় করছে। অন্যদিকে নারীদেরকে ও যৌনকে পণ্য করার সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটাচ্ছে। এসবের পুরো প্রভাব পড়ছে মৌলবাদ বিকাশ, নারীর উপর নিপীড়নের বাড়বাড়ন্ত, সামাজিক নৈরাজ্য ও যৌন বিকৃতির বিকাশের উপর। একদিকে সরকারি টিভি চ্যানেলগুলো পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও আলোচনায় ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে ভারতীয় হিন্দি ও বাংলা চ্যানেলগুলোর পারিবারিক ড্রামা নামের সিরিয়াল ও বাণিজ্যিক

সিনেমাগুলোর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নারী গৃহিনী ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে। একইসাথে ভারতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী পর্ণো, প্রতিক্রিয়াশীল হিংসা, অলীক ব্যক্তি বীরত্ব, আজগুবি সায়েন্স ফিকশন নামের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির জোয়ারে দেশীয় শিল্প সংস্কৃতি মৃতপ্রায়। অতি স্বল্প বিকশিত দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উপর মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত করে নতুন করে ভারতীয় বাংলা ছবির আগ্রাসন শুরু হয়েছে হাসিনা সরকারের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে।

* উপরোক্ত পরিস্থিতিতে জনগণ, শ্রমিক কৃষক সাধারণ জনগণ, ছাত্র-তরুণ-নারী-আদিবাসীরা মাঝে মাঝেই আন্দোলনে নামছেন। বহু রক্ত আর নিপীড়নের বিনিময়ে গার্মেন্ট শ্রমিকরা তাদের মজুরি অল্পই বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। যা প্রয়োজনের চেয়ে এখনো বহু কম। তাজরিন গার্মেন্ট শ্রমিকদের আন্দোলন একটি সংগঠিত আন্দোলন ছিল যার আরো বিকশিত ও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ ছিল। গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় হচ্ছেন। অন্যান্য শ্রমজীবীদের তো দূরের কথা, শিল্প শ্রমিকদের পর্যন্ত বাসস্থান চিকিৎসা সন্তানদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ও দায়িত্ব মালিক পক্ষ ও রাষ্ট্র করেনা। গার্মেন্টস শ্রমিকসহ অন্যান্য শিল্প শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, চা-শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিকরা মাঝে মাঝে বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন। খুলনার পাট-কল শ্রমিক, নৌ-শ্রমিক ও চা-শিল্প শ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ছাত্র-তরুণ-নারীরা আন্দোলন করছেন শিক্ষা সংকোচন, দুর্নীতি, নারী নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে। ভ্যাট-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন তনুসহ ধর্ষিতা নারীদের ন্যায্য বিচার চাওয়ার আন্দোলনগুলোও জনগণের সংগ্রামমুখীতাকে প্রকাশ করেছে। গোবিন্দগঞ্জ, নাটোর, বৃহত্তর রাজশাহী, টাঙ্গাইল ও পাহাড়ে আদিবাসীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন ও করছেন। প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক জনগণ রামপাল, গণ্ডামারা, অরুয়াইলসহ পরিবেশ ধ্বংসকারী কৃষি জমি ও ভিটেমাটি আত্মসাৎকারী বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী মুৎসুদ্দি 'উন্নয়ন' প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। জনগণ সংগ্রাম করছেন তিস্তা নদীর পানি বন্টন, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখ বাঁধসহ পরিবেশ ও নদী বিধ্বংসকারী ভারতীয় চক্রান্ত, এবং তার সাথে জাতীয় বেইমান হাসিনা সরকার ও শাসকশ্রেণির নতজানু দালালী ভূমিকার বিরুদ্ধে। তারা সংগ্রাম করছেন রুশ সাম্রাজ্যবাদের দালালীর প্রতীক পরিবেশ ধ্বংসকারী রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে।

কিছু কিছু আশু দাবি কখনো কখনো আদায় হলেও সাধারণত জন-আন্দোলনগুলোকে দমন করা হচ্ছে বর্বরভাবে। ছাত্র-তরুণদের আন্দোলন প্রগতিশীল ও বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত না হয়ে বরং এক ধরনের বিরাজনীতিকরণের দ্বারা প্রভাবিত থাকছে। গ্রাম-শহরের সাধারণ কৃষক ও মধ্যবিত্ত ছাড়াও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত

ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের মাঝে বিদেশগামীতার চেতনা বিরাটভাবে বিকাশ ঘটেছে।

এর পাশাপাশি রয়েছে বিপ্লবী আন্দোলন বিশেষত মাওবাদী আন্দোলনকে গুম, ক্রসফায়ার, মিথ্যা মামলা, বর্বর শারীরিক অত্যাচার, অর্থআদায়, উচ্ছেদ ও লুটপাটের মাধ্যমে সমূলে উচ্ছেদ করার এক ফ্যাসিবাদী অভিযান, যাতে খুনী বাহিনী র‍্যাব বিগত ১২ বছর ধরে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। যা কার্যত প্রশাসনের উপর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকেই প্রকাশ করে। এটা ভারতীয় 'র' ও মার্কিনী সিআইএ-এর 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'র যৌথ কার্যক্রমের অধীনে প্রশিক্ষিত ও মদদপ্রাপ্ত। সুতরাং এটা বলা চলে যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে ভিন পোশাকে সেনাবাহিনী এবং তাদের বিদেশী নিয়ন্ত্রকদের সামরিক পরিকল্পনা ও পাল্টা-তৎপরতাকে।

এর মোকাবেলায় মাওবাদী আন্দোলন কার্যকরভাবে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে এটা আমাদের স্বীকার করা উচিত। এর ফলে এ আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। বহু নেতা কর্মী ও সমর্থক জনগণ শহীদ হয়েছেন ও হচ্ছেন। সংগঠন ও সংগ্রাম বিরাটভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যা আবার সামগ্রিক প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুতরভাবে দুর্বল ও বিপথগামী হওয়ার সাথে যুক্ত ও তার অধীনস্ত। এ অবস্থাটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি বড় দিক হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে, যাকিনা প্রতিক্রিয়ার সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারীতাকে চালিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলেছে। যাকিনা শ্রমিক কৃষকের উপর শোষণ এবং যথেচ্ছ লুটপাট বিদেশের দালালী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, নারীদের উপর নিপীড়ন আদিবাসী জনগণের উপর নিপীড়ন বিহারী জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন ছাড়াও খোদ শাসকশ্রেণির মাঝে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি ও ইসলামী শক্তিগুলোর উপরও সম্প্রসারিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিঃশর্ত সমর্থন ও মদদ এই ফ্যাসিবাদী অবস্থাকে বজায় রাখতে সহায়তা করছে।

– তবে এর মাঝেও আমাদের পার্টিসহ মাওবাদী তথা প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা পুনর্গঠিত হওয়া, রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, সাংগঠনিক বিকাশ ঘটানো, এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে রক্ষা ও জাগরিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়াও দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ইস্যুগুলোতে সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজকে এগিয়ে নিচ্ছেন, যদিও তা দুর্বল। মাওবাদীরা ছাড়াও বিভিন্ন প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিভিন্ন জাতীয় ও জনস্বার্থ সম্পৃক্ত ইস্যুতে সংগ্রাম গড়ে তুলছেন। আর এসবের কারণেই কিছু কিছু দাবির কাছে শাসক ও রাষ্ট্র মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে।

এসবই দেখায় যে, বস্তুগত পরিস্থিতি বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। সংশোধনবাদীরা যেভাবে দেখাতে চায় যে, পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য অনুকূল নয় সেটা বস্তুগত অবস্থার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা বাস্তবে বিপ্লব না করবার

জন্যই এ জাতীয় মূল্যায়ন বাজারে ছাড়ে, যাতে তরুণ সমাজ ও বিপ্লবী জনগণ সে কাজে আগ্রহী না হয়ে দৈনন্দিন সংগ্রামেই আটকে থাকেন এবং তাদেরকে সংস্কারবাদীতে পরিণত করা সহজ হয়।

– তবে এসব সত্ত্বেও এটাও হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বস্তুগত পরিস্থিতির তুলনায় বিপ্লব ও জনগণের প্রগতিশীল শক্তি অনেক দুর্বল। জনগণের এই শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে শুধুমাত্র প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে। সংশোধনবাদীদের একটা অংশ শাসকদের লেজুড়ে পরিণত হয়ে তাদের ক্ষমতার অংশীদার হয়ে চূড়ান্তভাবে অধঃপতিত ও জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা শাসক দলের বিটিম-ও নয়, সিটিম ডিটিমের ভূমিকায় অভিনয় করে নিজেদের আখের গুছানোর পার্টিতে পরিণত হয়েছে। বামদের মধ্যকার সরকার-বহির্ভূত প্রধান অংশটি (সিপিবি, বাসদ, বামমোর্চা, দলছুট বামপন্থী প্রভৃতি) '৭১-এর চেতনা ও মৌলবাদ জুজুর খপ্পরে পড়ে কার্যত আওয়ামী রাজনীতিকেই শক্তিশালী করছে, যদিও জনগণের কিছু আশু দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চায়। কিন্তু তারা নগরকেন্দ্রীক, কৃষক বিচ্ছিন্ন, নগরেও মধ্যবিত্ত ছাত্র ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ক্ষুদ্র পরিসরে আটকা। তারা সর্বহারা শ্রেণির কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, বিপ্লবী মতবাদ ও বিপ্লবী কর্মসূচির ধারে-কাছেও নেই।

এ পরিস্থিতি একদিকে কমিউনিজমের আদর্শ ও মতবাদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা গড়ে তোলে, অন্যদিকে সংশোধনবাদী বাধাকে অপসারিত করার মাধ্যমে বিপ্লবী মতবাদ, রাজনীতি ও সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে ইতিবাচক শর্তও সৃষ্টি করে। প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের উচিত হচ্ছে একে কাজে লাগানো ও নিজেদের বিকাশে একে ব্যবহার করা। তাদের উচিত হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কাছে গিয়ে তাদের সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলা– যাদের মাঝে এখন কোন রাজনৈতিক শক্তিই কার্যত সক্রিয় নয়। শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের মাঝে ভিত্তি গাড়া– যেখানে বুর্জোয়া চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের প্রাধান্য থাকলেও ব্যাপক শ্রমিকদের মাঝে বিপ্লবী সংগঠন গড়া ও অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ার সুযোগ ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদ, ভারতের নির্লজ্জ দালালী ও ধর্মীয় মৌলবাদী তৎপরতার পরিস্থিতিতে ছাত্র-তরুণদের কাছে প্রগতিশীল মতবাদ কর্মসূচি ও সংগ্রামকে তুলে ধরে তাদেরকে কমিউনিজমের আদর্শে টেনে আনার সুযোগও রয়েছে। এভাবে বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী সংগ্রামকে গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা সম্ভব।

বিশ্ব, আঞ্চলিক ও দেশীয় পরিস্থিতি হয় বিপ্লবের দিকে আগাবে, নতুবা ব্যাপক জনগণকে অধিকতর রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ, মৌলবাদ, নারী নিপীড়ন, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিপীড়ন, অভিবাসী নিপীড়ন, মানবেতর জীবন– এসবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বব্যবস্থাকে আমূল বদলে ফেলা ব্যতীত বিশ্বের ও দেশের নিপীড়িত শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ জনগণের আর কোন

ভবিষ্যত নেই। জনগণকে সেপথেই আগাতে হবে এবং আমাদেরকেও সেপথেই জনগণকে পথ দেখাতে হবে। যা নির্ভর করছে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার অংশ হিসেবে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির উপর।

(৩)

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন

দুঃখজনকভাবে আন্দোলনের পরিস্থিতি ঠিক এ সময়টায় ভালো নেই।

আপনারা জানেন যে, ১৯৭৬ সালে মাও সেতুঙের মৃত্যুর পর পরই সমাজতান্ত্রিক চীনে একটি প্রতিবিপ্লবী কুদ্যেতার মাধ্যমে সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল এবং চীনকে একটি পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করেছিল। এর ফলে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশের আর অস্তিত্ব থাকেনি এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বন্দ্বটির সাময়িক অবসান ঘটেছিল সুদীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর পরে। এটা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর বড় আঘাত হেনেছিল।

কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিয়োগান্তক বিকাশকে মোকাবেলা করার জন্য দ্রুতই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মাওবাদীরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ১৯৮৪ সালে বিশ্ব-মাওবাদীদের ঐক্যের কেন্দ্র রূপে 'রিম' গঠন করেছিলেন। যদিও ভারত ও ফিলিপাইনসহ মাওবাদীদের একটা অংশ রিমে যোগ দেয়নি, কিন্তু রিমের নেতৃত্বে মাওবাদীরা তত্ত্ব ও প্রয়োগে, বিশেষত কমিউনিস্টদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত অভিজ্ঞতার সারসংকলনের কাজে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলা ও একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইন গড়ে তোলা, একটি নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক গঠনের ক্ষেত্রে প্রভূত ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করা, পেরুর গণযুদ্ধের বিকাশ, নেপালের গণযুদ্ধের বিকাশ, ভারত ফিলিপাইন বাংলাদেশ ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি– প্রভৃতির মাধ্যমে রিম এগিয়ে চলে প্রায় দুই দশক ধরে। এই অগ্রগতি দ্বন্দ্ববিহীন ছিল না এবং সেটা হওয়া সম্ভব ও বাস্তব ছিল না। কিন্তু রিম মূলত ঐক্যবদ্ধ থেকে বিভিন্ন ভুল লাইন ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগত সংগ্রাম পরিচালনা করে– রিমের বাইরে এবং রিমের অভ্যন্তরেও।

কিন্তু এই অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রথম দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে

বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে। এর কারণ ছিল রিমের নেতৃত্বকারী পার্টিগুলোর কোন কোনটির নেতৃত্বের মাঝে বিচ্যুতিপূর্ণ ও অবিপ্লবী লাইনের বিকাশ। রিমের ভেতরে এনিয়ে গুরুতর মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, যা দুই লাইনের সংগ্রাম আকারে বিকাশ লাভ করে। যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত রিম-পন্থীদের মাঝে বড় আকারে বিভক্তির সৃষ্টি হয় এবং রিম অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক পক্ষে রিমের অভ্যন্তরস্থ দুই লাইনের সংগ্রাম আকারে বড় মতপার্থক্যের সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই পেরুর পার্টির অভ্যন্তরে একটি ডান সুবিধাবাদী লাইনের উদ্ভবের সময় থেকে– যা পার্টির বন্দী শীর্ষ নেতাদের নামে (যার মাঝে প্রধানভাবে পার্টি-নেতা কমরেড গণজালোর নামও ছিল) উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শুধু এটাই যে পেরুর বিপ্লবকে অভ্যন্তর থেকে বিপথগামী করে তা নয়। তাকে মোকাবেলায় পার্টির তৎকালীন সিসি একটি ভুল অবস্থান নেয়– তাকে দুই লাইনের সংগ্রাম আকারে পরিচালনা না করে নিছক শত্রুর ষড়যন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন ক'রে। একইসাথে এই দুই বিপরীত ধরনের লাইনের ঐক্য দেখা যায় "গণজালো চিন্তাধারা" বলে তারা যা উত্থাপন করতো তার প্রতি তাদের উভয় পক্ষেরই আনুগত্য প্রকাশের মধ্যে। তারা উভয় পক্ষই দাবি করতে থাকে যে তাদের দ্বারা অনুসৃত লাইনের প্রণেতা হলেন তৎকালে বন্দী পার্টি-নেতা কমরেড গণজালো। এটা ইতিমধ্যেই শত্রুর দমনে দুর্বল হয়ে পড়া পেরুর গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী সংগ্রামকে বিভ্রান্তিতে ফেলে ও দিশাহীন করে তোলে। শুধু তাই নয়, এটা রিমের অভ্যন্তরেও বিবিধ ভুল চিন্তাধারার জন্ম দেয়, বিভক্তির বীজ বপন করে। কিন্তু তৎকালে– ৯০-দশক জুড়ে– রিমের অন্যান্য নেতৃত্বকারী ও অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে পেরু-প্রশ্নে মোটামুটি একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেয়ার কারণে রিম এগিয়ে চলে।

পেরু-সমস্যার অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে খোদ গণজালোর ব্যক্তিগত ভূমিকা নিয়ে সৃষ্ট ধোঁয়াশা, যাকে খোদ পেরু-পার্টির নেতৃবৃন্দই সবচাইতে বেশি ঘোলাটে করে তোলে। যখন গণজালোর নামে "শান্তি লাইন" বলে পরিচিত ডান সুবিধাবাদী লাইনটির প্রকাশ ঘটে, তখন সে ব্যাপারে পেরু-পার্টির সিসি অনুসন্ধান পর্যন্ত করতে উদ্যোগী ছিল না। তথাপি রিম-কমিটির নেতৃত্বে যতটা অনুসন্ধান করা হয়েছিল ও পরবর্তীকালে আরো যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে গণজালোর ভূমিকা-যে গণযুদ্ধকে স্থগিত ক'রে কোন না কোন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে ছিল তাতে সন্দেহ করার বড় কোন কারণ ছিল না। কিন্তু বস্তুগত বাস্তবতা থেকে সিদ্ধান্ত না টেনে, এমনকি রিম-অভ্যন্তরেও এমন একটি "রাজনৈতিক সত্য"-কে টেনে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয় যাতে বলা হচ্ছিল যে, গণজালো কোন ভুল করতে পারেন না, কারণ তিনি 'জেফে' স্তরের নেতৃত্ব। এই 'জেফেতুরা' তত্ত্ব গণজালো চিন্তাধারার একটি স্তম্ভ ছিল, যা মার্কসবাদী বস্তুবাদের বদলে একটি ব্যক্তিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে। এই অমার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পেরু-পার্টির মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রামকে

এগিয়ে নেয়া ও এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী লাইনের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে, পার্টির নেতা-কর্মী ও জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিণতিতে পেরু বিপ্লবে সার্বিক এক বিপর্যয় নামিয়ে আনে। উপরোক্ত জেফেতুরা-মতাদর্শ এমনকি বিপ্লব ও পার্টির এই সার্বিক সংকট ও বিপর্যয়কে পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়, যার প্রভাব রিমের মধ্যেও বিরাজ করছিল। সেগুলো পরবর্তীকালে রিম-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার একটি উদ্যোগ (২০১১ সালে কমরেড অজিতের নেতৃত্বাধীন ভারতের এনবি (নক্সালবাড়ী গ্রুপ নামে পরিচিত সিপিআই-এম.এল.-এর একটি কেন্দ্র), ইতালীর মাওবাদী পার্টি ও আফগান মাওবাদী পার্টি– যারা সকলেই ইতিপূর্বে রিম-সদস্য ছিল, তাদের দ্বারা আহুত একটি 'বিশেষ সভা'–এসএম)-এও লক্ষ করা গেছে, যার সাথে আমাদের সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল।

এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে 'চিন্তাধারা' সম্পর্কে একটি ভুল চেতনাও তখন রিম-অভ্যন্তরে বিকাশ লাভ করে, যার মর্মকথা হলো প্রতিটি দেশে মালেমা'র প্রয়োগগত রূপ হিসেবে পৃথক পৃথক চিন্তাধারা প্রয়োজন। এটা মালেমা ও কমিউনিজমের আদর্শের আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিকে বিকশিত করে, যা আমাদের দেশেও "এসএস-চিন্তাধারা" ও "সিএম-শিক্ষা" প্রচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং তাদের যে মতাদর্শ সেটি হলো আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন। সুতরাং কমিউনিস্ট মতাদর্শ একেক দেশে একেক চিন্তাধারার কথা বলে না। কমিউনিস্ট মতবাদের বিকাশ হলো আন্তর্জাতিকতাবাদী বিকাশ। উপরোক্ত জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ২০০১ সাল থেকে নেপাল বিপ্লবেও বিকাশ লাভ করে 'প্রচন্ড পথ' গ্রহণের মাধ্যমে। 'পথ' বললেও কার্যত তা ছিল 'চিন্তাধারা'রই অনুরূপ। এভাবে রিমের মধ্যেও পেরুর এই মতাদর্শিক সমস্যাগুলো বড় আকারে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, যা পরবর্তীকালে রিম-বিলুপ্তির অন্যতম বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। রিমের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে পেরু পার্টির এই বিচ্যুতিগুলোকে চিহ্নিত না করা একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিরাজ করছে, যা রিম পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে রয়েছে।

মাওবাদ ও গণযুদ্ধের সর্বজনীনতা গ্রহণের ক্ষেত্রে গণজালো ও পেরু-পার্টি '৮০-দশকে অবদান রাখলেও, এবং তারা প্রথম থেকেই রিমের সদস্য হলেও, রিমে তাদের ভূমিকা ধারাবাহিক ও সুদৃঢ় কখনই ছিল না। তেমনি মতাদর্শ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরিসরে 'প্রধানত মাওবাদ' ও দেশীয় পরিসরে 'প্রধানত গণজালো চিন্তাধারা'র একটি নতুন ফর্মুলা এনে তারা মতবাদিক ও মতাদর্শিক অখণ্ড অবস্থানের ক্ষেত্রে আরেকটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। গণযুদ্ধের সর্বজনীনতার প্রশ্নেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশের ক্ষেত্রে এর দুটো মৌলিক পথের প্রশ্নেও তারা অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশার প্রকাশ ঘটায়। যার প্রভাব আমরা পরে লক্ষ করি কোনো কোনো পার্টির পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতেও সাধারণভাবে

'দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ'র রণনীতি কার্যকর দাবির মধ্য দিয়ে। এগুলো রিম পরিসরে প্রথম দিকে বিতর্ক-পর্যালোচনা-আলোচনার বিষয় আকারে থাকলেও পরবর্তীতে রিম-বিভক্তিকালে আন্তর্জাতিকভাবে ও দেশে দেশে এসব তাত্ত্বিক বিতর্ক বড় ভূমিকা রাখে।

তাই এটা বলা চলে যে, রিম পেরুর শান্তি-লাইনে ঐক্যবদ্ধ একটি বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করলেও পেরুতে উদ্ভূত পরিস্থিতির সার্বিক বিষয়ে রিম-অভ্যন্তরে কোন ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ছিল না। তথাপি রিম মৌলিক ঐক্যের ভিত্তিতে এগিয়ে চলছিল এবং মতপার্থক্যগুলো নিরসনের জন্য রিম-অভ্যন্তরে 'স্ট্রাগল' নামে একটি জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে দুই লাইনের সংগ্রামগুলোকে বিকশিত ও সমাধান করার একটি ভাল পথও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এটা অল্প কিছুদিন চলবার পর অন্যসব নেতিবাচক বিকাশ তাকে আটকে দেয়। এই নেতিবাচক বিকাশগুলোর মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, রিমের অন্যতম প্রধান পার্টি নেপাল পার্টির অভ্যন্তরে একটি সংশোধনবাদী লাইনের উদ্ভবের ঘটনা। যার নেতৃত্ব দেয় পার্টির প্রধান নেতৃত্ব প্রচণ্ড ও তার সহযোগী ভট্টরায়। প্রচণ্ড-ভট্টরায় চক্রটি পেরু পার্টির 'চিন্তাধারা' তত্ত্বের ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ২০০১ সাল থেকেই আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে সরতে শুরু করে এবং পার্টিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। এ সময়েই তারা 'ফিউশন' তত্ত্বের নামে কার্যত দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথকে দুর্বল করতে শুরু করে। যা পূর্ণতা পায় ২০০৬ সালে রাজতন্ত্রের পতনের পর। সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্রের বিকাশের নামে ২০০৩ সাল থেকে তারা কার্যত ১৮-শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের তত্ত্বকে মহিমান্বিত ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে সরে যেতে শুরু করে। এটি তাত্ত্বিক রূপ পেতে থাকে ২০০৪ সালে তাদের মুখপত্র 'ওয়ার্কার'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে 'নতুন রাষ্ট্র' নামের সংশোধনবাদী তত্ত্বে, যা রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্বকে দুর্বল করে দেয়। এই বিচ্যুতি ২০০৬ সালে রাজতন্ত্রের পতনের পরবর্তীতে নেপালের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে মিত্রতার তাত্ত্বিক ভিত্তি সৃষ্টি করে এবং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 'উপস্তর'-এর নামে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বন্দরে তরী ভিড়ায়। এভাবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে তারা সরে যায়। কিন্তু এসব কিছুই তারা করে মালেমা'র বিকাশের নামে। এর ফলশ্রুতিতে নেপালের সম্ভাবনাময় বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব বিপ্লবের এক অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে।

– রিমের অভ্যন্তরস্থ এইসব নেতিবাচক ঘটনার বিরুদ্ধে আমেরিকার মাওবাদী পার্টি, আরসিপি, যা রিমের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃত্ব, গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের সূচনা করে। কিন্তু অচিরেই ইতিপূর্বেই তাদের মধ্যে সূচিত মালেমা'র বিকাশের নামে সৃষ্ট প্রবণতাটি বিচ্যুতিপূর্ণ পথে এগিয়ে চলে। আরসিপি "কমিউনিজমের নয়া সংশ্লেষণ" নামে একটি নতুন ধারণাগুচ্ছ উত্থাপন করতে থাকে। তারা দাবি করে যে, ১৯৭৬ সালে মাও-মৃত্যু ও চীনের সংশোধনবাদে অধঃপতনের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের সংগ্রামের প্রথম স্তরের সমাপ্তি ঘটেছে, যে প্রথম স্তরের সূচনা হয়েছিল

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, অথবা ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন, অথবা ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে (প্রথম স্তরের সূচনার সময়ের ক্ষেত্রে আরসিপি'র বিভিন্ন দলিলে বিভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায়)। তারা মনে করে যে, মালেমা'র তত্ত্ব কমিউনিজমের সংগ্রামের প্রথম স্তরের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রধানত ও বিপুলায়তনের ইতিবাচক অবদান রেখেছিল, কিন্তু একইসাথে সেই সংগ্রামে নেতিবাচক দিকও ছিল, যার কিছু কিছু গুরুতর। সেসব ভুল থেকে কমিউনিস্ট তত্ত্বকে মুক্ত করলেই মাত্র তাকে পরবর্তী স্তরে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এর অর্থ হলো মালেমা কমিউনিস্ট বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আর পর্যাপ্ত নয়। এই স্তরে নতুন এক তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োজন, যা বিগত সমগ্র স্তরটির গোটা তাত্ত্বিক কাঠামোকে নতুন গুণগত স্তরে এগিয়ে নেবে। আরসিপি এখন দাবি করছে যে, তাদের পার্টি-চেয়ারম্যান বব এ্যাভাকিয়ান (বিএ) উত্থাপিত 'নয়া সংশ্লেষণ' (নিউ সিনথেসিস– এনএস) হলো সেই তাত্ত্বিক কাঠামো, যা এখনো সম্পূর্ণ নয়, এবং যাকে তারা আরো এগিয়ে নেবে।

তাদের এই দাবি রিম-অভ্যন্তরে ব্যাপক বিতর্ক ও বিভাজন সৃষ্টি করে। পেরুর বিপ্লবের বিপর্যয় পরবর্তীকালে নেপালের বিপ্লবেরও বিপথগামী হওয়ার পর রিম ও বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে যে প্রতিকূলতা দেখা গিয়েছিল তার সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার বদলে আরসিপি'র এই অবস্থান তাকে আরো দুর্বল করে দেয়। বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। বিশেষত আরসিপি'র এই দাবি তাদেরকে রিমের পূর্বতন ভিত্তিতে, মালেমা ও অর্জিত রিম-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, রিমকে এগিয়ে নিতে অস্বীকারের দিকে চালিত করে। অন্যদিকে এনএস-কে বিরোধিতা করতে গিয়ে রিম-অভ্যন্তরস্থ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, যার মাঝে রয়েছে ভারতের এনবি বা নেপালের কিছু শক্তি, কার্যত ভিন্নভাবে রিম-অর্জনকে বর্জনের দিকে পরিচালিত হয়। যারা পূর্ব থেকেই রিমের বাইরে ছিলেন সেরকম মাওবাদী শক্তির একাংশ রিমের এই প্রতিকূলতা বিভক্তি ও অকার্যকরতার পরিস্থিতিতে তাদের পশ্চাদমুখী লাইনে রিম-বিরোধিতাকে বাড়িয়ে দেয়– যার মাঝে ভারতের মাওবাদী পার্টিও রয়েছে। এভাবে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে, তথা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি গুরুতর প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যাকে শুধু তুলনা করা চলে ২য় আন্তর্জাতিকের নেতা মহান এঙ্গেলসের মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিকূল অবস্থার সাথে, যখন কিনা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদ থেকে বিপরীতে হাঁটা শুরু করেছিল। সে অবস্থায় মহান লেনিনের নেতৃত্বে তাত্ত্বিক ও বাস্তব সংগ্রাম কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনরায় গতি দিয়েছিল এবং রুশ বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। অথবা তাকে তুলনা করা যায় মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালের মহাসংকটের সাথে, যখন কিনা রিম গঠনের মাধ্যমে সে প্রতিকূলতাকে কাটানোর ক্ষেত্রে বিপ্লবী কমিউনিস্টরা অগ্রগতির পথে এগিয়েছিল। তাই বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই লাইন-সংগ্রাম উপরোক্ত দুটো সময়ের মতই ব্যাপক গুরুতর ও সার্বিক এক মহাবিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যেক্ষেত্রে সঠিক অবস্থান

গ্রহণের উপরই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনঃঅগ্রগতি নির্ভর করছে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত অভিজ্ঞতা এটা বলে যে, সেটা ঘটতে বাধ্য, কিন্তু তা কতটা দ্রুত ঘটবে বা না ঘটবে সেটা আন্তরিক মাওবাদীদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই নির্ভর করে।

– এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মালেমা একটি বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শ হিসেবে এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না এবং তাকে অবিরত বিকাশ করতে হবে। বাস্তবে মাও-মৃত্যুর পর রিম গঠনের মাধ্যমে মাওবাদীরা সে পথেই অগ্রগতি ঘটাচ্ছিলেন। রিম ৩য় 'আন্তর্জাতিক' বিলুপ্তির প্রাথমিক সারসংকলন ক'রে নতুন একটি আন্তর্জাতিক গঠনের দিকে এগুচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ৩য় আন্তর্জাতিকের নেয়া ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ লাইনের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিচ্যুতিকে সারসংকলন করেছিল, মাওবাদ গ্রহণ করেছিল, গণযুদ্ধের সর্বজনীনতাকে গ্রহণ করেছিল, এবং তত্ত্ব লাইন ও প্রয়োগের আরো আরো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল। রিম-অভ্যন্তরে প্রধান নেতৃত্বকারী পার্টিগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু সেকারণে রিম-কে এগিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না, 'পুরনো' তাত্ত্বিক ভিত্তিতে ও অর্জনের ভিত্তিতে, সেরকমটা আমরা মনে করি না। আরসিপি এক্ষেত্রে বিকাশের নামে নীতিগত অবস্থানকেই দুর্বল করে দিয়েছে এবং বর্তমানের বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি মহান স্তম্ভকে– রিম-কে বর্জন করে বসেছে। আর এ কাজে তাদেরকে প্রণোদিত করেছে এনএস। তাই এনএস-এর গুরুতর আলোচনা করাটা বিশ্ব আন্দোলনে অপরিহার্য।

আমরা এনএস-এর কিছু বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছি যাকে অবশ্য আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য আন্তরিক মালেমা-বাদীদের সহযোগে এগিয়ে নেয়া, তার সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা বা এমনকি বিচ্যুতিকে কাটিয়ে তোলা প্রয়োজন। এটা নিয়ে আরসিপি'র সাথেও আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে মতবিনিময় ও বিতর্ক পরিচালনা করা দরকার। আমরা মূল্যায়ন করেছি যে, এনএস-এর মূল সমস্যা হলো মালেমা'র শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণি অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়া। এটাই তাদেরকে পরিচালিত করেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলন করতে গিয়ে মার্কসবাদী মেথডলজী থেকে সরে যাওয়া, নীতি থেকে সরে যাওয়া, অতীত অভিজ্ঞতার নেতিবাচক দিকের কারণে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাকে অনেকটা সরলরৈখিকভাবে ও এক কাতারে স্থাপন করা, তাকে সবমিলিয়ে একটি পুরনো স্তর বলে চিহ্নিত করা এবং এভাবে অতীতকে নেতিকরণ করায়। যদিও মালেমা'র বহু আলোচনা ও ব্যাখ্যা এবং বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার উপর গবেষণা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে আগামীতে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে অধিকতর দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ ভুল নয়।

এনএস-এর সাথে মালেমা-বাদী অবস্থানের পার্থক্যগুলো ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে মূল যে বিষয়গুলো তুলে ধরা যায় সেগুলো অনেকটা এরকম–

এনএস সর্বহারা শ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তির মতবাদ হিসেবে মালেমা-বাদী অবস্থানের জায়গায় একটি 'মানবমুক্তির মতবাদ'-এর চেতনাকে সামনে নিয়ে এসেছে। শ্রেণি স্বার্থ ও শ্রেণিসংগ্রামকে গৌণ করে দিয়ে 'বিজ্ঞান'-কে তা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরছে। বস্তুগত বাস্তবতার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার নামে চেতনায় বস্তুগত বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন হিসেবে চেতনার সত্যতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং এভাবে চেতনায় বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন সত্যের বস্তুগত নিয়মকে– 'শ্রেণি সত্য' বা 'রাজনৈতিক সত্য'র গুরুত্বকে বাতিল করে দিচ্ছে। তারা জনগণের ও নিপীড়িত শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধকে কেন্দ্রবিন্দু না করে তার বৈজ্ঞানিক সঠিকতাকে ভিত্তি করার নামে কার্যত জনগণের সংগ্রাম থেকে সরে যাচ্ছে। এনএস 'কেমন সমাজ চাই'-কে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন হিসেবে এমনভাবে তুলে ধরছে যা গণযুদ্ধের প্রশ্ন ও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রশ্নটিও-যে, নির্দিষ্ট দেশে তার বিবিধ দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সহকারেই, এ লাইনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়– তাকে দুর্বল করছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লবের মূর্ত প্রশ্নটিকে তারা দুর্বল করছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জিপিসিআর-কে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা বলে এবং 'পুরনো ধরনের সমাজতন্ত্র আর চাই না' বলে গোটা সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে কার্যত নেতিকরণ করছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোচনায় তারা 'দুই অচল' সূত্র তুলে ধরে মৌলবাদের প্রশ্নটিকে একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম-কাতারের শত্রুর মত করে উপস্থাপন করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ জনগণের ধর্মীয় বিভ্রান্তি-উদ্ভূত ভূমিকাকে তারা অবমূল্যায়ন করছে এবং ধর্মের অনৈতিহাসিক মূল্যায়ন দ্বারা চালিত হচ্ছে। তারা বিপ্লবের মূল কর্মসূচিকে তুলে ধরার নামে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূতকরণের মাওবাদী কৌশলকে কার্যত বাদ দিয়ে প্রধান দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষের উপর গুরুত্ব প্রদানের আড়ালে সমাজতন্ত্র বা নয়া গণতন্ত্র রূপে সর্বহারা/সর্বহারা নেতৃত্বে একনায়কত্বের স্তরগুলোর রণনৈতিক গুরুত্বকে ম্লান করে দিচ্ছে।

আরসিপি বলছে যে, এনএস-এর প্রক্রিয়া এখনো চলমান। তারা এর উপর বিতর্ক বিকশিত করতে আগ্রহী। এবং আগামী কমিউনিস্ট বিপ্লবকে অধিকতর সঠিক ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। আমরা আশাকরি প্রকৃতই তারা এই বিতর্ক বিকাশে বাস্তব পদক্ষেপ নেবে এবং শুধুই এনএস সমর্থনকে সামনে এগিয়ে দেবে না– যদিও তাদের সিসি কর্তৃক সাম্প্রতিককালে গৃহীত ৬টি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এর বিপরীতেই তাদের বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে (২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত আরসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির ৬টি সিদ্ধান্ত)। এর উপর নির্ভর করছে

আরসিপি শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটবে– সর্বহারা বিপ্লবের পথে, নাকি মানবতাবাদী সাম্যবাদের নামে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানের পথে– সেটা নির্ধারিত হবে।

সুতরাং আমরা মনেকরি যে, এনএস ও তার সাথে গণজালো চিন্তাধারা ও প্রচন্ড পথ– ইত্যাদি যেসব তত্ত্বগত কাঠামো রিমের অভ্যন্তরে অমীমাংসিত ছিল এবং ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে সেগুলো নিয়ে বিশ্ব মাওবাদীদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী কমরেডসুলভ ব্যাপক বিতর্ক বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। যার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবের বর্তমান প্রতিকূলতার কারণসমূহ আরো স্পষ্ট ও সঠিকভাবে বেরিয়ে আসবে এবং আগামীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব নতুন উচ্চতায় পুনরায় গড়ে উঠবে। পাশাপাশি আমরা মনেকরি যে, রিমের তাত্ত্বিক ভিত্তি মালেমা ও তার অর্জনগুলোর ভিত্তিতে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের বিশ্ব পরিসরে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া আজ সময়ের জরুরি দাবি। বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্য-প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমাদের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বিপ্লবী শক্তি ও বিপ্লবী সংগ্রামকে, বিশেষত গণযুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রমকেও পুনরায় গতিশীল করতে হবে। ইতিপূর্বে 'কমপোসা' গঠন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল, যা 'রিম' সংকটের প্রক্রিয়ায় স্থবিরতায় পড়েছে। একে পুনর্জীবিত করার উদ্যোগও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এইসব ঐক্য অর্জনের সংগ্রাম এবং তার মধ্যে বিতর্ক বিকাশের গুরুত্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনরায় অগ্রগতির পথে স্থাপন করবে বলে আমরা আশাকরি।

– এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যারা শুরু থেকেই রিমের বাইরে ছিলেন, এবং এখনো রিম গঠনকে সমর্থন করেন না, তাদের মাঝে ভারতের মাওবাদী পার্টি ও ফিলিপাইনের মাওবাদী পার্টির মত গুরুত্বপূর্ণ পার্টিও রয়েছে। তাদেরকে আমরা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই অংশ মনেকরি। সুতরাং উপরোক্ত অবস্থানগুলোতে তাদের সাথেও বিতর্ক ও ঐক্য প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনেকরি। কিন্তু সেজন্য, ঐক্যের স্বার্থে, রিম-লাইন ও রিম-অর্জনকে বাদ দিয়ে পিছনে হাঁটাকে আমরা সঠিক মনে করি না। এটা করলে তা হবে একটি ঐক্যবাদী ও সমন্বয়বাদী কাজ। তাই, অগ্রসর ও মিমাংসিত রিম-লাইনগুলোকে যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে, তা সে যত ছোট উদ্যোগই হোক না কেন। যেমনটা ১৯৮৪ সালে রিম গঠনের সময়টাতে মাওবাদীরা করেছিল। একইসাথে বহির্ভূত প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্টদের সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক রক্ষা করে যৌথ-কার্যক্রমের ক্ষেত্রগুলোকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলে লাইন-সংগ্রামকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে উচ্চতর ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যেমনটা রিম করেছিল গোটা '৮০ ও '৯০-দশক জুড়ে। এ প্রক্রিয়াটিই বিশ্বের সকল বিপ্লবী কমিউনিস্টদেরকে একটি সঠিক ও উচ্চতর লাইনে ধাপে ধাপে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে বলে আমরা মনেকরি।

(৪)

দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের এই পরিস্থিতির মাঝেই বিরাজ করছে আমাদের দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন। এবং তাকে সেভাবেই দেখতে হবে। কারণ, কমিউনিস্ট আন্দোলন কোন দেশীয় বা জাতীয় আন্দোলন নয়; এটা হলো আন্তর্জাতিকতাবাদী ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন। তাই আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইনের মৌলিক সমস্যার সমাধান না করে, তাতে মৌলিকভাবে কোন ভুল অবস্থান নিয়ে বা তার প্রতি উদাসীন থেকে কোন 'দেশীয়' আন্দোলন সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না। আমাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ও ধারা প্রচুর দেখা যায়। ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্তির পরবর্তী দীর্ঘ চার দশক কোন আন্তর্জাতিক না থাকার কুফলগুলোর মাঝে এটি হলো অন্যতম প্রধান নেতিবাচক দিক।

যদিও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব অবশ্যই রয়েছে, এবং আমাদেরকে অবশ্যই সেগুলোকে আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে, কিন্তু বিশ্ব আন্দোলনের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে তা সম্ভব নয়। সুতরাং দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আলোচনাতেও বিশ্ব আন্দোলনের ধারাগুলো কিভাবে বিরাজ করছে, এবং তার ধারাবাহিকতা কী, সে আলোচনাটিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ শত্রু সংশোধনবাদী রাজনীতির প্রধান ধারাগুলোকে আগে দেখে নেয়া প্রয়োজন।

* ষাট দশকে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনও আর সব দেশের মতই 'রুশপন্থী' ও 'চীনপন্থী' বা মাওচিন্তাধারাপন্থী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এবং মাও-মৃত্যুর পর তা একদিকে মাওবাদী এবং অন্যদিকে চীনা-তেং পন্থী ও হোক্সাপন্থী ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। মাওপন্থী বা মাওবাদী ধারার বিরোধী ধারাগুলোই সংশোধনবাদী মূল ধারাগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

– মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর '৫০-দশকের মাঝামাঝি ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিবাদের পথে ধাবিত করলে এদেশের প্রধান নেতৃত্বরা মনি সিং-মোজাফ্ফর-ফরহাদদের নেতৃত্বে ক্রুশ্চেভীয় লাইনে অধঃপতিত হয়। যাদেরকে সাধারণ ভাষায় 'রুশপন্থী' বলা হয়ে থাকে (সিপিবি ও সমমনা-প্রভাবিতরা)। সোভিয়েত পুঁজিবাদ '৬০-দশকের শেষ দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদে

পরিণত হলে এরা বামপন্থার নামে মার্কিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালালে পরিণত হয়। এবং সে অবস্থান থেকেই তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল বিরোধিতা শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে '৭১-সালের যুদ্ধে তারা ভারত-সোভিয়েতের লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে বাঙালি উঠতি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের পার্টি আওয়ামী লীগের বিটিমে পরিণত হয়, মুজিব-আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের ফেরিওয়ালা হয়, জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের কাছে বিক্রি করার কাজে আওয়ামী লীগের সহযোগী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় '৭৫-সালে তারা আওয়ামী লীগের সাথে একত্রিত হয়ে ফ্যাসিবাদী 'বাকশাল' গঠন করে এবং শাসকশ্রেণির ও রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয়।

৯০-দশকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর, এবং বিশেষত রাশিয়া খোলামেলাভাবে ক্লাসিক্যাল পুঁজিবাদের পথ ধরার পর এই গোষ্ঠীটি আন্তর্জাতিক মুরুব্বির অভাবে পড়ে। কিন্তু তারা '৭১-এর চেতনা বা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে এবং '৭২-সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে শাসকশ্রেণির আওয়ামী উপদলটির মৌলিক রাজনীতিকেই অব্যাহত রেখেছে। তবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বির অভাবের কারণে তারা এখন আর সরাসরি শাসকশ্রেণির অংশ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছে না, মার্কিনী ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কিছু কিছু পলিসির বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করছে এবং শ্রেণি ও জনগণের বিভিন্ন সংস্কারবাদী অর্থনীতিবাদী সংগ্রামে তারা যুক্ত রয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তারা অনেক আগেই খারিজ হয়ে গেছে, যদিও তারা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট নামেই পরিচিত করে। একইসাথে সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসেবেও তাদের কোন চরিত্র নেই এবং সেই ধারাই তারা অব্যাহত রেখেছে। তাদের মধ্যকার একটি অংশ আগেই আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। শাসক শ্রেণির অপর প্রধান ধারা, বিএনপি'র বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা আওয়ামী রাজনীতিরই 'বামপন্থী' অংশ রূপে কাজ করে। যদিও তারা প্রায়শই 'তৃতীয় ধারার রাজনীতি' বিকাশের কথা বলে, সমাজতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু সেটা বিদ্যমান রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির মৌলিক রাজনীতি ও ব্যবস্থার অধীনে জনগণের আশু দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে কিছু অর্থনীতিবাদী সংস্কারবাদী রাজনীতি, এবং সময়ে সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কিছু কিছু পলিসির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বেশি কিছু নয়।

– রুশপন্থী সংশোধনবাদীরা ছাড়াও এদেশের বাম আন্দোলনে জাসদ ও পরে বাসদ একটা বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এই ধারাটি নিজেদেরকে কখনও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ হিসেবে দাবি করেনি। যদিও সম্প্রতি তাদের একটি অংশকে দেখা যায় যারা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট হিসেবে দাবি করে। তরুণ-ছাত্রদেরকে তারা কিছুটা বিভ্রান্তও করে। তাই তাদের বিষয়টিও এখানে তুলে ধরা দরকার।

এরা কখনো কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ ছিল না ও নেই। তারা মূলত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট– যা গঠিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র,

অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ ও নির্বাচনবাদ-সংসদবাদের মিশ্রণে। জাসদ তৈরি হয়েছিল '৬০/'৭০-দশকের বিপ্লবী জোয়ারকালে কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে, বিশেষত মাওবাদী আন্দোলন থেকে জঙ্গি ও বিপ্লবমনা তরুণদেরকে দূরে রাখার জন্য, তাদেরকে বিপথগামী করার লক্ষ থেকেই। আওয়ামী লীগের জঙ্গি বিটিম হিসেবেই একে গড়ে তোলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'র' (ভারতীয় রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা - Reasearch and Analysis Wing)-এর ভূমিকার বিষয়টিও আলোচিত। '৭০-দশকে তাদের সে লক্ষ অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। কিন্তু পরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে এদের প্রধান অংশটি শাসকশ্রেণির আওয়ামী বলয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অপর একটি অংশ বাসদ নামে বামপন্থী হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করলেও তারা তাত্ত্বিকভাবে এক জগাখিচুড়ি। আওয়ামী লীগ থেকেই জাসদের সৃষ্টি হয়েছিল, যা থেকে পরে বাসদের বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হয়। যদিও বাসদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগ ও জাসদের উত্তরাধিকার এখন অস্বীকার করে, কিন্তু তারা এখনো ঐ রাজনীতিগুলোকে ধারণ করে রয়েছে ব্যাপকভাবে। তারা '৭১-এর চেতনা ও '৭২-সালের সংবিধানকে সিপিবি'র মতো একইভাবে ধারণ করে; তারা পুরনো জাসদের সোশ্যাল ডেমোক্রেসিকে ধারণ করে; তারা মাও-এর কথাও বলে এবং মাও-এর ভুলের কথা বলার মাধ্যমে কার্যত মাওবাদকে বিরোধিতাও করে, যা তারা শিখেছে তাদের গুরু ভারতের শিবদাস ঘোষের অনুসরণে। তারা আসলে শিবদাস-পন্থী, যারা কমিউনিস্ট রাজনীতির বাইরে একটি 'স্বতন্ত্র' পথ অনুসরণ করে, মাওবাদী আন্দোলনকে হঠকারী বলে বিরোধিতা করে, ক্ষুদে বুর্জোয়া বাম গোষ্ঠীরূপে কাজ করে, এবং সময়ে সময়ে শাসকশ্রেণির বুর্জোয়াদের এই বা ঐ অংশের সাথে হাত মেলায়। এতদিন ধরে জাসদ-বাসদের ফ্রন্ট রাজনীতি ক'রে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে 'নিউক্লিয়াস' আকারে চালিয়ে এখন এর কিছু অংশ খোদ বাসদকেই সেই কমিউনিস্ট পার্টি বলে দাবি করছে। এদের একটা অংশ (খালেকুজ্জামান গ্রুপ) এখন সিপিবি'র সাথে জোট বেঁধেছে। অন্য অংশ (হায়দার গ্রুপ) নিজেদেরকে মার্কসবাদী দাবি করলেও কার্যত প্রকৃত শিবদাস-পন্থী হওয়ার দাবিও করছে।

* '৬০/৭০-দশকে মাওপন্থীরাই এখানকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু এদের সিংহভাগ মাওবাদের উপলব্ধির অভাবে দ্রুতই সংশোধনবাদের পথ ধরে। একটা অংশ (জাফর-মেনন, দেবেন-বাশার প্রমুখ) নকশাল আন্দোলনের উন্মেষকালে ভারতের মাওবাদী বিপ্লবী উত্থানের প্রশ্নে, এবং পরে '৭১-সালে মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে নগ্নভাবে মাওবাদকে ও বিপ্লবী আন্দোলনকে বিরোধিতা করে। অপর বাকী প্রধান অংশটি (ইপিসিপি-এম.এল, সাম্যবাদী দল, পূবাকপা ও আমাদের পার্টি থেকে বেরুনো বিরাট কয়েকটি গোষ্ঠী) সত্তর দশকের বিপ্লবী সংগ্রামের বিপর্যয়ের পর, বিশেষত চীনের পুঁজিবাদে অধপতনের পর, সংশো-

ধনবাদের পথ ধরে। এদের প্রধান একটি অংশ চীন-তেং পন্থার পথ ধরে বিবিধ সংশোধনবাদী গ্রুপ (যেমন, কমিউনিস্ট লিগ) গঠন করে; আর অপর প্রধান অংশ (যেমন, হক-গ্রুপ নামে পরিচিত বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি বা জিয়াউদ্দিন- কামরুল গ্রুপ নামে পরিচিত বরিশাল-কেন্দ্রীক তথাকথিত সর্বহারা পার্টি) আলবেনিয়ার সংশোধনবাদী হোক্সাপন্থায় গড়িয়ে পড়ে। এদের অভিন্ন অবস্থান ছিল মাও চিন্তাধারা, গণযুদ্ধ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (জিপিসিআর)-কে বিরোধিতা করা। নকশাল আন্দোলন ও কমরেড চারু মজুমদার (সিএম)-কে বিরোধিতা করা। এদেশে '৭০-দশকের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামকে বিরোধিতা করা।

যে অংশটি নকশাল আন্দোলনকে ভারতের জ্যোতিবসুদের অনুসরণে হঠকারী বলে ডানপন্থায় বাঁক নিয়েছিল তারাই '৭১-এর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পথ ধরে। এরা বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রভাবে রুশ-ভারতকে বিরোধিতা করলেও মাওবাদ, গণযুদ্ধ ও জিপিসিআর-কে বিরোধিতায় তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে এবং চীনের সংশোধনবাদে অধঃপতনের অবস্থায় প্রথম সুযোগেই চীনা-তেংদের দালালে পরিণত হয় (জাফর-মেনন প্রমুখ)।

অন্য অংশটি সে সময়ে মূলত বিপ্লবী রাজনীতিকে তুলে ধরলেও '৭০-দশকের বিপ্লবী আন্দোলনের সার্বিক বিপর্যয় পরবর্তী উদ্ভূত ডান বিলোপবাদী লাইন, এবং কিছু পরেই চীনের সংশোধনবাদের পথ ধরে এদের প্রধান অংশটি চীনাপন্থার নামে মাও-চিন্তাধারার বিপ্লবী পথ ত্যাগ করে, যদিও ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদের সাথে তাদের আদি বিবাদের কারণে তারা নিজেদের দলিলে মাওচিন্তাধারার কথা বলে চলে (ইপিসিপি-এমএল, সাম্যবাদী দল, পূবাকপা থেকে বেরুনো বিভিন্ন গ্রুপ)। তারা '৭০-দশকের বিপ্লবী উত্থানকে বিরোধিতা করে, বিশেষভাবে ভারতের সে উত্থানের প্রধান নেতা সিএম-কে নগ্নভাবে ও জঘন্যভাবে আক্রমণ করে, গণযুদ্ধকে বিরোধিতা করে, জিপিসিআরকে বিরোধিতা করে, গোপন বিপ্লবী পার্টিসত্ত্বাকে সরাসরি বা কার্যত বিরোধিতা করে।

এই সমগ্র অংশগুলোই চীনের কমিউনিস্ট পোশাক পরা সারমর্মগত খোলামেলা পুঁজিবাদের কারণে অচিরেই আন্তর্জাতিক মুরুব্বির অভাবে পড়ে। তাদের কেউ কেউ শাসকশ্রেণির দুটো প্রধান পার্টিতে যোগ দিয়ে চূড়ান্তভাবে জনগণের শত্রুশ্রেণিতে স্থান নেয়।

* এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট রাজনীতির বদলে, বা তাকে 'গোপন' রেখে বা কার্যত গৌণ করে ফ্রন্ট রাজনীতিকে সামনে আনার একটি প্রধান ধারা বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে এখন ক্রিয়াশীল, যা বর্তমানে সংশোধনবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট।

এর মাঝে রয়েছে দুটো অংশ– যারা মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা রাখে

এরকম একটি অংশ (যেমন, উমর-পন্থীসহ কাছাকাছি মতাদর্শের কিছু গ্রুপ ও ব্যক্তিত্ব), আর অন্যটি (যেমন, বাম মোর্চা) হলো উপরে আলোচিত সিপিবি-বাসদ ধারা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারার মধ্যবর্তী একটি উপ-ধারা।

মধ্যবর্তী উপ-ধারাটির সবারই অভিন্ন সমস্যা হলো পার্টি-গঠনের মূল প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে বা দুর্বল করে ফ্রন্ট রাজনীতি করা, ফলত কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও লাইনগত বিতর্কগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলা বা নীরব থাকার সুবিধাবাদী পথ গ্রহণ করা। তারা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির বদলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী কাজকেই ভিত্তি করে, শ্রমিক বা কৃষকদের মধ্যকার কাজ যেটুকু তারা আনে সেটা অর্থনীতিবাদী লাইনে পরিচালনা করে। তাদের তাত্ত্বিক সমস্যা হলো গণযুদ্ধকে বিবিধ যুক্তিতে বিরোধিতা করা, কৃষক সমস্যাকে না বোঝা এবং/বা পুঁজিবাদের বিকাশের নামে কৃষককে বর্জন করা, জি-পসিআর-কে বিরোধিতা করা বা না বোঝা এবং মাওবাদকে বিরোধিতা করা বা তা না বোঝা। এসব কারণেই রিম-কেও বিরোধিতা করা বা সে সম্পর্কে নীরব থাকা।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারাটির একটি ক্ষুদ্র অংশ (যেমন, কমিউনিস্ট লিগ) এখনো মাওচিন্তাধারার নাম দিয়ে পুরনো তেং-মার্কা ধুনের নেশা কাটাতে পারেনি। যদিও তাদের বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছেছে চীনের খোলামেলা পুঁজিবাদী পথ পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কারণে। পুরনো মাওপন্থী রাজনীতির প্রভাব ও রেশ ধরে রেখে এরা মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা রাখতে চায়, কৃষকদেরকে সংগঠিত করতে চায়, এবং কৃষক ও শ্রমিকদেরকে বিপ্লবের জন্য জাগরিত করতে চায়। কিন্তু গণযুদ্ধের বিরোধিতা এবং সামগ্রিকভাবে মাওবাদের প্রশ্নে তাদের চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থান তাদেরকে নিঃশেষ করার দিকে পরিচালিত করছে।

আরেকটি অংশ (উমর-পন্থী) বহু আগে থেকেই মাওবাদ, গণযুদ্ধ, কৃষক রাজনীতি বাদ দিয়ে অভ্যুত্থানের নামে শহুরে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী কাজকে এবং ফ্রন্ট রাজনীতিকে আশ্রয় করে আগাচ্ছে।

* '৭০-দশকের মহাবিতর্ককালে চীনা-তেং সংশোধনবাদকে বিরোধিতা করলেও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের একটি অংশ মাওবাদ বর্জন করে হোক্সাপন্থায় গড়িয়ে পড়েছিল। হোক্সাপন্থীরা মাওবাদকে বিরোধিতার সূত্র ধরে দেশীয় বর্তমান বিপ্লবী কাজে নয়া গণতন্ত্রকে বিরোধিতা করে এবং ফলে গণক্ষমতার কর্মসূচিতে তাদের বিবিধ বিভ্রান্তি দেখা যায়। '৭১-এর মূল্যায়ন প্রশ্নে তারা জাতিগত সমস্যার ক্ষেত্রে গোড়ামীবাদী সংশোধনবাদ অনুসরণ করে ও জনগণের জাতিগত আকাঙ্ক্ষা মর্যাদাবোধ ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নে তাদের একাংশ সনাতন আধা-সামন্তবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলোর বিষয়ে গোড়ামীবাদী নিস্পৃহতার প্রকাশ ঘটায়, অন্য অংশ মাও-এর কৃষক সমস্যার গুরুত্বকে বাতিল করার প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

লাইনের বিপরীত ভ্রান্তি নিয়ে আসে। তারা অভ্যুত্থানের কথা বলে গণযুদ্ধকে বিরোধিতা করে। কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে তারা মূলত অর্থনীতিবাদী লাইনের কাজ করে। তারা মাওবাদবিরোধিতায় খুবই সোচ্চার। ফলে তারা এক বিভ্রান্তি ও গোলকধাঁধাঁর জালে আবদ্ধ। মাওবাদী তথা প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিকাশের মুখে তাদের বিভ্রান্তি ও দিশাহীনতা ব্যাপকতর ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তারা এখনো মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা রাখে। একইসাথে শ্রমিক কৃষকের মধ্যকার কাজ ও তাদের চলতি সংগ্রাম প্রচেষ্টা তাদেরকে কিছু ইতিবাচক ভূমিকায় রাখে।

* ষাট-সত্তর দশকের মাওবাদী বিপ্লবী সংগ্রাম মার খেয়ে যায় শত্রুর প্রচণ্ড ও বর্বর দমনে এবং অভ্যন্তরস্থ লাইনগত সমস্যার কারণে। তাকে কাটিয়ে তুলে মাওবাদী আন্দোলনকে নতুন ভিত্তিতে এগিয়ে নেয়ার বিগত প্রচেষ্টাগুলোর কারণে পরবর্তী সময়গুলোতে কয়েকবারই দেশব্যাপী ও স্থানীয়ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল। আমাদের পার্টি রিমে যোগ দেয়ার কারণে এবং বিশ্বব্যাপী রিমের অগ্রসর লাইন ও মর্যাদা এবং রিম-পার্টিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সংগ্রাম ও তাত্ত্বিক কাজের ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশেও লাইন ও বাস্তব সংগঠন-সংগ্রামে নতুনতর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু সেগুলো পরিণতিতে যাওয়ার পূর্বেই মাওবাদী সংগ্রাম শত্রুর দমনে দুর্বল হতে থাকে এবং মাওবাদী বিশ্ব আন্দোলনের বিভক্তি ও সংকটের সাথে এবং তাতে উদ্ভূত বিবিধ বিচ্যুতির সাথে তা জড়িয়ে যায়। আমাদের পার্টি এবং অন্য প্রধান মাওবাদী ধারা পূবাকপা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মতবাদিক, আর্থসামাজিক ও গণযুদ্ধ সম্পর্কিত লাইনগত বিবিধ বিচ্যুতি আন্দোলনকে গ্রাস করে। এবং আন্দোলন গুরুতর রূপে দুর্বল হয়ে পড়ে।

* এমনই একটি সময়ে ২০০৯ সালে আমরা মাওবাদী আন্দোলনের চার দশকের অভিজ্ঞতার একটি মৌলিক ও প্রাথমিক সারসংকলন পেশ করি। যাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুতর তাত্ত্বিক ও লাইনগত বিতর্কগুলোর উপর আমাদের পার্টির একটি সার্বিক উচ্চতর ও আত্মপর্যালোচনামূলক নতুন অবস্থান তুলে ধরা হয়, যাকে আমরা "নতুন থিসিস" নামকরণ করেছি। এই নতুন থিসিস বিগত অভিজ্ঞতাসমূহের এবং আন্তর্জাতিক নতুন মহাবিতর্কের একটি সার্বিক মূল্যায়ন পেশ করলেও কতকগুলো বিষয়ে তার অসম্পূর্ণতাকেও উল্লেখ করে। যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এনএস সম্পর্কে পর্যালোচনার অসম্পূর্ণতা এবং দেশীয় আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতা। এটি ১৯৯২ সালে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক লাইন ও নতুন সামরিক লাইনের উপর এবং পরবর্তীতে সামরিক লাইনের বিতর্কের উপরও মূল্যায়ন পেশ করে। এই নতুন থিসিস ২০১১ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়। আমরা এর মৌলিক অবস্থানের সাথে একমত। এবং তার অসমাপ্ত কাজগুলোকে

আমরা এখন আরো এগিয়ে নিতে চাই। যা রিম বিলুপ্তির উপরোক্ত সারসংকলনে কিছুটা বিবৃত হয়েছে এবং ৩য় কংগ্রেসের লাইনের আরো সুনির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নে পরে আরো বিবৃত হবে।

– এটা বলা চলে যে, দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্ব আন্দোলনের সংকট ও সমস্যাবলীই এখন বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। যার উৎস হলো লাইনগত দুর্বলতা, বিচ্যুতি ও সংশোধনবাদ। যা উপরে আলোচিত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে– বিশ্বে উদ্ভূত নতুন বিকাশগুলোর প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিগুলো। যার মাঝে রয়েছে– ৩য় বিশ্ব, যা বিশ্ববিপ্লবের ঝটিকা কেন্দ্র, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ফলে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলো, এবং আমাদের রণনীতিকে সেগুলো কীভাবে প্রভাবিত করছে সেই প্রশ্নাবলী। এ বিষয়টিতে সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনেই দুর্বলতা বিরাজ করছে ও বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি কাজ করছে। আমাদের দেশে আন্দোলনের সংকটের ভিত্তিমূলে রয়েছে এসব সমস্যাই। তবে তার সাথে আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনের নিজস্ব গুরুতর ভুলগুলো ও বিচ্যুতিগুলো যুক্ত হয়ে সংকটকে অনেক স্থূলভাবে ও ব্যাপকভাবে বিকশিত করেছে।

আমাদের পার্টি ও পূবাকপা'র বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে কয়েকটি কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটেছিল সেগুলোর প্রায় সবগুলোই, আমাদের পার্টি বাদে, হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বা রাজনৈতিকভাবে বিলুপ্তির পথে। আমাদের এই দুটো প্রধান ধারার বাইরেও কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী ছিল। সেগুলোও হয় বিলুপ্ত, নতুবা তাদের কার্যক্রম খুবই সীমিত হয়ে গেছে। এই সংকট ও দুর্বলতাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের লাইনের দুর্বলতাতেই আগে খুঁজতে হবে।

এই লাইনগত সমস্যাবলীর কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো হলো মতবাদিক বা মতাদর্শিক সমস্যা, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের সমস্যা, গণযুদ্ধের একটি সার্বিক সঠিক লাইন নির্মাণের সমস্যা, পার্টি-গঠনের সমস্যা, ফ্রন্ট গঠনে সমস্যা এবং রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও তার প্রয়োগের সমস্যা। এ বিষয়গুলোতে নতুন থিসিসে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তার সংক্ষিপ্ত একটি উত্থাপন করাটাই এখানে যথেষ্ট হবে।

** এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন সূচনা থেকেই মতবাদিক প্রশ্নটিতে দুর্বল ছিল। ষাট-সত্তর দশকে এ আন্দোলন জিপিসিআর-কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেও তাকে প্রকৃতপক্ষে সেরকম গভীরভাবে উপলব্ধি ও ধারণ করা হয়নি। গণযুদ্ধের তত্ত্বকে খুবই দুর্বলভাবে গ্রহণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতি থেকে যায়। এগুলো মতাদর্শগত-রাজনৈতিকভাবে যে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, সর্বহারা শ্রেণি-রাজনীতির দুর্বলতা, বিপ্লবী রাজনীতির উপলব্ধিতে দুর্বলতা, দ্বন্দ্ববাদের উপলব্ধিতে সমস্যা, প্রয়োগবাদ– ইত্যাদি বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলো আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন নির্মাণ এবং পার্টি ও ফ্রন্ট গঠনে বড় বড় ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্ম দেয়।

– সাম্যবাদী দল–বিএসডি'র যে ক্ষুদ্র ধারাটি (কমরেড মোস্তাকের নেতৃত্বে) রিমে যুক্ত হয়েছিল তারা আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে '৮০ ও '৯০-দশকে একটি ইতিবাচক অবস্থান নিলেও নিজেদেরকে বিপ্লবী রাজনীতি ও গণযুদ্ধের লাইনে কখনই সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করতে পারেনি। তারা ছিল মূলতঃ '৭০-দশকের বিপ্লবী সংগ্রামের বিপর্যয়-পরবর্তী বিলোপবাদেরই ধারক। রিম-মাধ্যমে নিজেদেরকে সংশোধিত পুনর্গঠিত ও বিকশিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। ফলতঃ নেতৃত্ব-সর্বস্ব দলে পরিণত হয়ে তারা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

– পূবাকপা ধারাটি মতাদর্শিক ক্ষেত্রে ষাট-সত্তর দশকে ভারতে সিএম-অবদানের ঊর্ধ্বে আর উঠতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আর এগিয়ে নিতে পারেনি। তারা 'খতম লাইন'-কে ব্যাপকভাবে একটি সংস্কারবাদী সশস্ত্রতায় অবনমিত করে। এমনকি তারা ভারতের মাওবাদীদের সারসংকলন থেকেও কোন শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে তারা নিজেদেরকে একটি সারসংকলনবিরোধী স্থূল প্রয়োগবাদী পার্টিতে নামিয়ে দেয়। তবে কমরেড রাকেশ কামালের নেতৃত্বে "লাল পতাকা গ্রুপ"টি এ শতাব্দীর প্রথম দশকে রিম ও কমপোসার প্রভাব, এবং আমাদের পার্টির সাথে আলোচনার প্রক্রিয়ায় নতুন ইতিবাচক পথে এগুতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে তারা পার্টি-ব্যাপী সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হয় বা তার সময় পায়নি। প্রধান নেতৃত্বের দুঃখজনক লসের মধ্য দিয়ে তারাও কার্যত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পূবাকপা'র মধ্য থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপ কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দেখা গেলেও সেগুলো লাইনগতভাবে কোনো একটা সুসংহত জায়গায় পৌঁছাতে পারছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। এমনকি এদের কোন কোন ক্ষুদ্র চক্র জনগণবিরোধী মাস্তান গ্যাং-এ অধপতিত হয়েছে বলেও ধারণা করা যায়।

– আমাদের পার্টি ১৯৯৮ ও '৯৯-সালে বিভক্ত হবার পর পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠিত দুটো কেন্দ্র মাপুকে ও এমবিআরএম লাইনের দিক থেকে নিজেদেরকে বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়। সশস্ত্র অনুশীলন ও এ প্রক্রিয়ায় কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এমবিআরএম-এর কিছু সফলতা থাকলেও মাপুকে তাতেও ব্যর্থ হয়ে বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমবিআরএম লাইনের প্রশ্নকে দুর্বল করে দিয়ে নিজেদের প্রয়োগবাদকে এত মাত্রায় বিকশিত করে যে এখন তাদের রাজনৈতিক কাজ প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে বলে দৃশ্যত ধারণা করা যায়।

– সর্বোপরি, উপরোক্ত কোন গ্রুপই রিম-বিভক্তি ও চলমান আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে কার্যত কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা তাদেরকে অকার্যকর শক্তিতে পরিণত করতে বাধ্য। এরকম ভূমিকার দ্বারা আরো কিছু রিম-সমর্থক শক্তিও নিজেদেরকে লাইন ও বাস্তব কর্মকান্ডে দুর্বল করে ফেলেছে, যারা আমাদের পার্টি-কাঠামোর বাইরে ছিল।

– একটি ব্যক্তিনির্ভর গ্রুপের অস্তিত্ব প্রধানত ইন্টারনেটে দেখা যায় যারা নতুন একটি পার্টির ঘোষণা দিয়ে চলেছে (মালেমা পার্টি), আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে গণজালো চিন্তাধারার অনুসারী, সিরাজ সিকদার চিন্তাধারার কথা বলে থাকে এবং তীব্রভাবে আমাদের পার্টিকে বিরোধিতা করে ও পার্টির বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা প্রচারণা করে থাকে।

গণজালো চিন্তাধারার প্রভাব আরো একটি মাওবাদী গ্রুপের মাঝেও রয়েছে যারা শেষ পর্যন্ত গণজালোর ভূমিকা, পেরু পার্টির পথভ্রষ্টতা এবং এসব-কেন্দ্রীক দুই লাইনের সংগ্রামের প্রভাবে কোন অবস্থান প্রকাশ্যে না নিয়ে বিভ্রান্তিকেই অব্যাহত রেখেছে।

– বিপ্লবী কমিউনিস্ট কেন্দ্রগুলোর এ ধরনের বিপর্যয় বিলুপ্তি ও কিছু ক্ষেত্রে অধঃপতন, বিপুল পরিমাণ নেতা ও কর্মীর শহীদ হওয়া গ্রেফতার-বরণ ও নিপীড়িত হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে কমিউনিজমের আদর্শ অনুসারী নেতা-কর্মীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। সর্বোপরি মূল জনগণ ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের কাছে সমাজতন্ত্রের পক্ষে এক বিপুল জনমত রয়েছে। জনমত রয়েছে গণযুদ্ধের পক্ষে। জনমত রয়েছে বিশ্ব-বিপ্লবের পক্ষে।

কিন্তু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন নেতা-কর্মীদের মূল সমস্যা হলো– মালেমা গ্রহণ না করা, মালেমা ও রিম-অর্জনকে ভিত্তি না করা, জিপিসিআর-কে না বোঝা, বর্তমান মহাবিতর্কে সক্রিয় অংশ না নেয়া, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইনের গুরুত্বকে উপলব্ধি না করা, পার্টি-গঠনকে আঁকড়ে না ধরা, কমিউনিজমের লক্ষে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরা, কৃষক সমস্যাকে আঁকড়ে না ধরা, কৃষক শ্রমিকের মাঝে ভিত্তি না করা, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে আঁকড়ে না ধরা ও বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামের অনুশীলনকে আঁকড়ে না ধরা– ইত্যাদি।

এগুলোকে তত্ত্বে ও অনুশীলনে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে আর্থ-সামাজিক বিতর্ককে বিকশিত করা ও কর্মসূচিকে সঠিকতর করা প্রয়োজন। একটি সফল গণযুদ্ধের জন্য একটি সঠিক লাইন বিনির্মাণের প্রচেষ্টার প্রক্রিয়াতে একটি মালেমা-বাদী নতুন ধরনের পার্টি গঠন করা প্রয়োজন। এবং তার নেতৃত্বে একটি উচ্চতর মানের বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসবের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চলমান সংকট কাটানো যেতে পারে।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এদেশে এখন আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি রয়েছে। তেমনি বাকি রয়েছে গণযুদ্ধের একটি সার্বিক সঠিক লাইনের বিনির্মাণে। এ বিষয়গুলোতে নতুন থিসিসে মৌলিক কিছু অবস্থানকে অতীত সংগ্রামগুলোর সারসংকলনের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়গুলোতে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাকালের ভিত্তিতে যে দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলো ছিল সেগুলো কখনই কেটে যায়নি। কিছু সমস্যা কাটানো হলেও নতুনতর বিচ্যুতিতে আন্দোলনকে পড়তে হয়েছে। এক্ষেত্রে পার্টির ৩য় কংগ্রেস কিছু

নতুন লাইন গ্রহণ করেছিল। যার উপর ব্যাপক বিতর্ক হয় এবং পার্টি ভেঙ্গে যাবার পিছনে সেগুলোর ভূমিকা ছিল। নতুন থিসিস এ বিষয়গুলোতে কিছু মৌলিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল, যাকে আমরা সঠিক মনেকরি এবং তাকে আরো এগিয়ে নিতে চাই। তাই ৩য় কংগ্রেসের লাইনগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত কিছু মূল্যায়ন এবং আমাদের বর্তমান বিকশিত অবস্থানগুলোকে নিচে পৃথক ভাবে তুলে ধরাটা প্রয়োজন।

(৫)

৩য় কংগ্রেস-লাইনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

কমরেডগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের পার্টির ৩য় জাতীয় কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে, যখন এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের এবং আমাদের পার্টির ঐতিহ্যিক কিছু মৌলিক লাইনকে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

– এই কংগ্রেসেই আমাদের পার্টির মতাদর্শকে "মাও সেতুঙ চিন্তাধারা"র বদলে "মাওবাদ" হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে তখনও আমাদের উপলব্ধির দুর্বলতা ছিল, যা পরে ধাপে ধাপে কাটানো হয়েছিল, যে সম্বন্ধে নতুন থিসিসে আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের সহযোগিতায় আমাদের মতাদর্শের এই নতুন ও সঠিকতর সূত্রায়ন পার্টির তাত্ত্বিক ভিত্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

– এই কংগ্রেসে মাওবাদ সূত্রায়ন গ্রহণ করা ছাড়াও যে দুটো লাইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয় সেগুলো হলো– ১) রাজনৈতিক লাইন; ও ২) সামরিক লাইন। এ বিষয়গুলোতে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক লাইন– জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ঃ

রাজনৈতিক লাইনের দুটো জায়গায় আমাদের লাইনকে সংশোধন করা হয়। প্রথমত, যে এসএস-লাইনের ভিত্তিতে আমাদের পার্টি গঠিত হয়েছিল তাতে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ছিল বলে এই কংগ্রেস মূল্যায়ন করে এবং তাকে সংশোধন করা হয়। এই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি প্রকাশিত ছিল পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নে ও তার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের তিনটি সময়কালের ক্ষেত্রেই।

কংগ্রেস মূল্যায়ন করে যে, প্রথমত, বৃটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বকে একটি

মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করাটা ভুল ছিল। এটা দ্বন্দ্বের সারমর্মকে না দেখে উপরি উপরি দেখেছিল এবং মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রভাবে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমলে, যখন পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন গঠিত হয় (১৯৬৮ সালে), পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং '৭১-এর সার্বিক জাতিগত যুদ্ধের আগেই পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার রাজনৈতিক কর্মসূচি পেশ করাটা ভুল ছিল। এটা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অধীনে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে পরিচালিত করার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী কর্মসূচিকে দুর্বল করেছিল এবং তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারের প্রভাবে পড়েছিল। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশ চিহ্নিত করাটা ভুল ছিল। এটা "পাকিস্তানের উপনিবেশ" লাইনের ভুলের ধারাবাহিকতায় এসেছিল, এবং সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশিক শৃঙ্খলের অধীনে পূর্ব বাংলার নতুন বিকাশটিকে মূল্যায়ন করতে ভুল করেছিল।

উপরোক্ত বিচ্যুতিরই ধারাবাহিকতায় কম.এসএস-এর মৃত্যুর পরও পার্টি '৭০ ও '৮০-দশক জুড়ে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করে যে রাজনৈতিক লাইন দিয়েছিল তার বিচ্যুতিকেও কংগ্রেস তুলে ধরে।

৩য় জাতীয় কংগ্রেস এই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি থেকে আমাদের পার্টিকে বের করে আনে এবং শ্রেণি দ্বন্দ্বকে প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করে। তবে কংগ্রেস এটাও মূল্যায়ন করে যে, '৭১-সালের মার্চ মাস থেকে বিকশিত ও পরিবর্তিত বিশেষ অবস্থায় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচি আনা প্রয়োজন ছিল, এবং '৭১-এর শেষদিকে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে অল্প কিছুদিনের জন্য জাতীয় সংগ্রামটিকে প্রধান হিসেবে সামনে আনারও প্রয়োজন ছিল।

এভাবে এই কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি সংশোধনের মাধ্যমে পার্টির রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণে সর্বহারা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করে।

রাজনৈতিক লাইন– কৃষি অর্থনীতির চরিত্র ঃ

একইসাথে কংগ্রেস রাজনৈতিক লাইনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়, যা শুধু আমাদের পার্টি নয়, এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন ও বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্যিক লাইনের সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় এবং শুধু আমাদের পার্টিতেই নয়, সমগ্র আন্দোলনেও বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দেয়।

কংগ্রেস মূল্যায়ন করে যে, শ্রেণি দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্ব হলেও তা মাওবাদী আন্দোলনের পূর্বতন ধারণা অনুযায়ী সামন্ত শ্রেণির সাথে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্ব নয়। বরং কংগ্রেস মূল্যায়ন করে যে, আদি সামন্তবাদ ক্ষয়ের পথে, আদি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণিটি এখন আর শাসকশ্রেণির প্রধান কোন স্তম্ভ নয়। তাই, বিপ্লবী ভূমি সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে অব্যাহত থাকলেও বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক

ভূস্বামীদের জমি দখল ও খোদ কৃষকদের মাঝে তার বন্টন কেন্দ্রীয় কর্মসূচি নয়। পূর্বতন সামন্তবাদী ভূস্বামী শ্রেণির স্থান দখল করেছে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি। তাই, আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির সাথে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটি হলো প্রধান দ্বন্দ্ব এবং এই শ্রেণিটিই হলো মূল শাসকশ্রেণি।

এরই সূত্র ধরে মূল্যায়ন করা হয় যে, অর্থনীতি বা কৃষির চরিত্রও আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়, বিকৃত পুঁজিবাদী, যাকে নেতৃত্ব দেয় আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি।

যদিও একইসাথে বলা হয় যে, সামন্তবাদের সাথে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্বটি অন্যতম মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবে অব্যাহত রয়েছে, বিপ্লবী ভূমি সংস্কার অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে বজায় থাকবে, বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিকই রয়েছে, কৃষক ও গ্রামাঞ্চলকেই সংগঠন ও সংগ্রামের প্রধান শক্তি ও ক্ষেত্র হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে।

উপরোক্ত মূল্যায়ন ও পরিবর্তনগুলো আনার ক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ, আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিরাট বিকাশ, আদি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণির ক্ষয় ও রূপান্তর এবং এসবের ফলশ্রুতিতে শ্রেণি সজ্জায় বিরাট পরিবর্তনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল।

– উপরোক্ত যে বিবেচনাগুলোর ভিত্তিতে ৩য় কংগ্রেস রাজনৈতিক লাইনের পরিবর্তনগুলো এনেছিল সেগুলোকে আমরা এখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেকরি। বরং বিগত দুই দশকের বেশি সময়ে এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে। '৯০-দশকের শুরু থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন পলিসির অধীনে দেশের কৃষি অর্থনীতিসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনগুলো এবং বিগত সময়জুড়ে দেশের তিনটি বড় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ও পরিবর্তনগুলো একে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

এই প্রধান তিনটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হলো– গার্মেন্ট শিল্পের বিরাট বিকাশ, প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রবাহ এবং কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি। উপরোক্ত তিনটি সেক্টরে বিরাট বিকাশের ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে যে একটা বড় প্রবৃদ্ধি ঘটে চলেছে সেটা জাতীয় সম্পদকে বিরাটভাবে বাড়িয়েছে এবং আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির দ্বারা সেই সম্পদ লুণ্ঠনের এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে এই শ্রেণিটির বিপুল বিকাশ ঘটেছে, যারা তাদের সম্পদের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করে দিলেও, আরেকটি বড় অংশ নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করা এবং অন্য অংশ একই ধারার উৎপাদনে বিনিয়োগের কারণে দেশের অর্থনীতিতেও তা বড় আকারে পরিবর্তন এনেছে।

অর্থনীতির উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে বিকাশের ফলে নগরায়ন বিরাটাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রেণি সজ্জাতেও চলমান পরিবর্তন বিকশিত হয়েছে অনেক বেশি মাত্রায়।

তাই, ৩য় কংগ্রেস যে মূল্যায়ন করেছিল যে, সামন্তবাদী ভূস্বামী শ্রেণিটি ক্ষয়িষ্ণু,

এবং আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি হলো বিকাশমান ও মূল শাসকশ্রেণি, এবং তার সাথে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটি হলো প্রধান দ্বন্দ্ব– এটি এখন আরো বেশি করে সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

৩য় কংগ্রেসের অবদানগুলোর মাঝে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের বহু কৃষি-প্রধান ৩য় বিশ্বের দেশের আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্ব দাবি রাখে বলে আমরা মনেকরি। তাই, এই প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিকভাবেই মাওবাদীদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে বলে আমরা মনেকরি। বিশ্বের বিপ্লবী কমিউনিস্টদেরকে যৌথভাবে এই নতুন বিকাশের প্রশ্নটিকে সমাধান করতে হবে।

শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তন ৩য় বিশ্বে আমাদের রণনীতি রণকৌশলকে কীভাবে প্রভাবিত করছে ও করবে সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে। নেপাল বিপ্লবে ফিউশনের একটি আলোচনা উঠেছিল যার কোন সফল সমাপ্তির আগেই তাকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ বর্জনের হাতিয়ার হিসেবে সেখানকার সংশোধনবাদীরা ব্যবহার করেছে। কিন্তু ফিউশনের আলোচনাটি আর্থ-সামাজিক এই পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ও উদ্ভূত বলেই আমাদের ধারণা। এ বিষয়টিকে আমাদের মতো দেশে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের নীতি ও কৌশল বিকাশের সাথে সংযুক্ত করেও দেখতে হবে বলে আমরা মনেকরি।

– আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও প্রধান দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সঠিকতাগুলো সত্ত্বেও ৩য় কংগ্রেস যে 'বিকৃত পুঁজিবাদ' উপসংহারটি টেনেছিল সে বিষয়ে আমাদের দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্ক দানা বেধে উঠে। তাকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করি। আমাদেরও উপলব্ধি ছিল যে এই উপসংহার সম্পর্কে আমাদের অবস্থান যথেষ্ট তত্ত্বসমৃদ্ধ ও তথ্যভিত্তিক ছিল না। তাই, আমরা এ বিষয়ে আমাদের পার্টিতে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভাল বিতর্ক-পর্যালোচনার জন্য প্রচেষ্টা চালাই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের পার্টিতে দুই লাইনের সংগ্রাম ভালভাবে বিকশিত হবার আগেই ভিন্নমতকারীরা পার্টি থেকে আলাদা হয়ে যাবার কারণে একে সেভাবে এগিয়ে নেয়া যায়নি। কিছু পরেই এর সাথে যুক্ত হয় রিমের নতুন সংকট– প্রথমে নেপালের সংশোধনবাদ, এবং কিছু পরেই এনএস-এর মতো মালেমা'র মৌলিক বিষয়াবলীকে ঘিরে বিতর্কের উদ্ভব– এবং এসবের ফলশ্রুতিতে অচিরেই রিমের বিভক্তি। এসবকিছুই এত সব নতুন ব্যাপক গভীর ও জটিল লাইন সংগ্রাম ও সংকটের মুখে আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের সাথে সাথে আমাদেরকেও নিক্ষিপ্ত করে যে, আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে বিতর্ক ও গবেষণা-কাজকে আর তেমনভাবে এগিয়ে নেয়া যায়নি। এক্ষেত্রে আমাদের পার্টির ও আন্দোলনের ঐতিহাসিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলোও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু আমাদের দিক থেকে যতটাই আগানো সম্ভব হয়েছে তাতে 'বিকৃত পুঁজিবাদ' সূত্রায়নে কতকগুলো দুর্বলতা আমাদের সামনে ভেসে উঠতে থাকে।

অবশেষে এ সম্বন্ধে নতুন থিসিস আলোচনা করে এবং ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলন 'বিকৃত পুঁজিবাদ' সূত্রায়নটি স্থগিত করে।

* উপরে আলোচিত কারণগুলোর জন্য (পার্টি-বিভক্তি ও রিম-বিভক্তি জনিত দুই লাইনের সংগ্রাম ও প্রতিকূলতাসমূহ) আমাদের পার্টিতে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও গবেষণায় এখনো যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি। এই রিপোর্টটি এ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণাকে তুলে ধরার জায়গা নয় এবং সেজন্য সিসি পার্টিকে ও নিজেকে প্রস্তুত করতেও পারেনি। এ বিষয়ে তত্ত্বগত কাজ এবং অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কাজকে আরো এগিয়ে নিতে হবে এবং পৃথক দলিল আমাদেরকে করতে হবে। তবে নতুন থিসিসে 'বিকৃত পুঁজিবাদ' সূত্রায়ন স্থগিত করাটা যথাযথ ছিল বলেই আমরা মনেকরি। এ অবস্থায় বর্তমানে কৃষি অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে আগে উত্থাপিত বিষয়গুলো বাদেও যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বিবেচনা করি সেগুলো সম্বন্ধে নিচে খুব সংক্ষেপে কিছু পয়েন্ট ও ধারণা শুধু উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথমত, সামন্ততান্ত্রিক বড় ভূস্বামী শ্রেণিটির ক্ষয় ও রূপান্তর ঘটেছে এটা পরিস্থিতির একটা দিক। কিন্তু তার বদলে কৃষির সার্বিক যে প্রধান বৈশিষ্ট ছিল ক্ষুদে উৎপাদন, তার মৌলিক রূপান্তর ঘটেনি। ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রেও তার কেন্দ্রীভবন তেমন বেশি হয়নি, বরং ক্ষুদে মালিকানাই তার প্রধান চরিত্র হিসেবে রয়ে গেছে। কিছু কিছু পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের পাশাপাশি পুরনো সামন্ততান্ত্রিক মালিকানাও বজায় রয়েছে।

এর অর্থ এটা নয় যে, কৃষকের নিঃস্বকরণ হচ্ছে না, বা জমির কেন্দ্রীভবন হচ্ছে না। সেটা গুরুতরভাবেই হচ্ছে। কিন্তু দখলিকৃত কৃষিজমির কেন্দ্রীভূত মালিকানা আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কল্যাণে অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে– যেমন, গার্মেন্টস-এর মতো আমদানী-রফতানী নির্ভর মুৎসুদ্দি শিল্প, ইঁটভাটা, আবাসন, জমি বেচা-কেনা ব্যবসা, ইকো পার্ক, সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও রাষ্ট্রীয় বৃহৎ প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ– ইত্যাদি কৃষি ধ্বংসকারী, পরিবেশ ধ্বংসকারী, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ও উৎপাদন বিচ্ছিন্ন প্রকল্পে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও বিদেশী বুর্জোয়ারা চিংড়ি চাষ, রাবার প্রজেক্ট, চিনি শিল্প, বীজ উৎপাদনসহ এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ করছে, তবে সেগুলো এখনো দেশের কৃষির মূল চরিত্র নয়। ক্ষুদে উৎপাদন ও ক্ষুদে মালিকানাই তার মূল চরিত্র।

ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদন নয়, তাকে 'বিকৃত' বা যা-ই বলা হোক না কেন। ৩য় কংগ্রেসকালে আমরা পণ্য উৎপাদনের ব্যাপকতার কারণে একে 'বিকৃত পুঁজিবাদ' বলার যে যুক্তি এনেছিলাম তা সঠিক ছিল না। পণ্য উৎপাদনের ব্যাপকতা পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট বটে, কিন্তু সেটিই তার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট নয়। আমরা তখন গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক দরিদ্র জনগণের নিঃস্বকরণকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এটাও পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট, কিন্তু কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট নয়। আমরা

সামন্তবাদী ভূস্বামী শ্রেণির ক্ষয় ও আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার মূল শাসকশ্রেণিতে পরিণত হওয়া থেকে মূল্যায়ন করেছিলাম যে, যেহেতু আমলা-মুৎসুদ্দি হলেও বুর্জোয়া শ্রেণি মূল নিয়ন্ত্রক, অর্থনীতি ও রাজনীতির, তাই অর্থনীতিটা পুঁজিবাদী হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির সামন্তবাদী বৈশিষ্ট, যার কথা মাও বলেছিলেন, তাকে কম গুরুত্ব দিয়েছি, ভালভাবে বুঝিনি, এবং এই প্রশ্নের মূল্যায়নে ভুল যুক্তিতে পরিচালিত হয়েছি। আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি একটি সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটালেও, যা অবশ্যই বিকৃত চরিত্রের, তা ব্যাপকভাবে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলোকেও রক্ষা করে ও তার দ্বারা লাভবান হয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট হলো মজুর নিয়োগ ও মজুর শোষণ, তার উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন, মুনাফার জন্য উৎপাদন– যা বৃহদায়তনের উৎপাদন গড়ে তোলে।

ক্ষুদে মালিকানা-ভিত্তিক ক্ষুদে উৎপাদনেও কৃষি মজুর রয়েছে, শ্রম-শোষণ রয়েছে, কিন্তু সেটা প্রধানভাবে পুঁজিবাদী নয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের কৃষিতে এখন পুঁজিবাদী উদ্যোগও যে বিকশিত হচ্ছে সেটা সত্য। মৎস্য খামার, ফল বাগান, পোলট্রি, ডেইরী, সব্জী, বীজ উৎপাদন, এবং বিবিধ বহুমুখী প্রকল্প– এধরনের বাণিজ্যিক কৃষির বড় বিকাশ ঘটেছে, যার একটা অংশে আদি কৃষির বদলে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক চাষ, মজুর নিয়োগ– এগুলোও বিকশিত হয়েছে।

কিন্তু এধরনের বাণিজ্যিক কৃষিরও একটা বড় অংশ হলো ক্ষুদে উৎপাদন ও ক্ষুদে মালিকানা, যা পুঁজিবাদী নয়। বাণিজ্যিক কৃষির ক্ষেত্রেও ভূমি ও অর্থের একটা বড় অংশের মালিকানার চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক। তদুপরি বাণিজ্যিক কৃষির দ্বারা কৃষকেরা পণ্য উৎপাদন করলেও তা তারা করে নিজেরা বেঁচে থাকার জন্য, পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈশিষ্ট হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। তাই, এটা পণ্য উৎপাদন করলেও তা ব্যাপকভাবেই পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন নয়।

এখানে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যা থেকে বোঝা সম্ভব যে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীনরা কীভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশকে ঠেকিয়ে রেখে ক্ষুদে উৎপাদনকে বজায় রাখাকে তাদের একটি মূল পলিসি হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতিতে এনজিও-ঋণ একটি বড় বিষয়। ড.ইউনুস ক্ষুদ্র ঋণের পিতা, যা থেকে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ক্ষুদ্র ঋণের মূল আদর্শটি হলো গ্রামীণ দরিদ্র ভূমিহারাদেরকে সর্বস্বান্ত হওয়ার পথ থেকে রক্ষা ক'রে তাদেরকে ক্ষুদে উৎপাদক ও ক্ষুদে মালিক হিসেবে টিকিয়ে রাখা। অথচ পুঁজিবাদের প্রয়োজন হলো নিঃস্ব শ্রমিক, যার শ্রম বিক্রি ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষুদে মালিকানার অর্থনীতি পুঁজিবাদের বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখে। একইসাথে ক্ষুদে মালিক ও ক্ষুদে উৎপাদকদেরকে ঋণের মাধ্যমে যে শোষণ তারা করে থাকে সেটিও পুঁজিবাদী সুদ নয়।

এনজিও-দের ক্ষুদ্র ঋণের সাথে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পলিসিও এখন যুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে চলমান "একটি বাড়ি একটি খামার" হলো এজাতীয় একটি প্রকল্প– যা হতদরিদ্র কৃষকদেরকে ক্ষুদে মালিক হিসেবে টিকিয়ে রাখে। এই ক্ষুদে উৎপাদকরা আদি কৃষকদের থেকে পৃথক এইভাবে যে, তারা উৎপাদন করছে বাজারের জন্য, অর্থাৎ তারা পণ্য উৎপাদন করছে, এবং সেটা করছে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী, লাভ যেখানে বেশি সেখানে, আজ এটা কাল ওটা। কিন্তু তারা এটা করছে প্রধানত নিজেদের শ্রমে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। তাদের উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদনের মতো করে মূলতঃ উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ দ্বারা মুনাফা অর্জনের জন্য নয়।

তারা শাসকশ্রেণির বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে সুদে টাকা নিচ্ছে যাতে আমলা মুৎসুদ্দি ও রাষ্ট্রের 'গরীবের ব্যাংক' বিকাশ লাভ করছে। তারা শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেসক্রাইব করা বীজ, সার, প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করছে এবং তাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। এভাবে এই ক্ষুদে অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও শাসকশ্রেণির শোষণের একটি নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা নিঃস্ব মানুষকে একেবারে ধ্বংস হওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে তাদের হুমকি প্রতিহত করছে। একইসাথে এ সমগ্র কাঠামো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির একটা অংশের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। যারা বিপ্লব ছাড়াই গরীব মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা দ্বারা নিজেদের আশ্বস্ত করছে, নিজেদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বকেও সচ্ছলতার দিকে চালিত করতে পারছে। এনজিও-গুলোর সংগঠক ও প্রধান নেতারা যে এক সময়ের বামপন্থী কর্মী ও নেতারা ও বুদ্ধিজীবীরা– সেটা বিস্ময়কর নয়।

এটা কৃষি ও কৃষকের প্রকৃত উন্নয়নের কোন পথ নয়। কারণ, কৃষির প্রকৃত অগ্রগতি ঘটতে পারে কৃষির ক্ষুদ্র জোত-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে যৌথকরণের বিকাশের দ্বারা। যা সম্ভব দুটো উপায়ে– পুঁজিবাদের পথে, নতুবা সমাজতান্ত্রিক যৌথকরণের মাধ্যমে। এর কোন পথেই বর্তমান ব্যবস্থাটি কৃষক ও কৃষিকে নিয়ে যাচ্ছে না। এদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের দিকে নেয়ার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু পুঁজিবাদের পথও বর্তমান ব্যবস্থা পরিস্কার করছে না।

– পুঁজিবাদের দিকে না যাবার বড় যে কারণ ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদন সেটাই আবার বহু বহু সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে ও সম্পর্কে কৃষককে বেঁধে রাখছে।

উপরে উল্লেখিত এনজিও ঋণের সুদ ছাড়াও কৃষক, জেলে ও তাঁতিরা, কামার ও কুমারেরা– যারা কৃষি ও কৃষকের সাথেই নিবিড়ভাবে যুক্ত– বহুবিধভাবে মহাজনী সুদী কারবারের হাতে বন্দী। তাদের উপর এখনো বহু জায়গায় রয়েছে বর্গা বা লিজ নামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। এ ধরনের ঋণ, দাদন, লিজ, বর্গা, এবং বহুবিধ পন্থায় ও নামে সামন্ততান্ত্রিক উপায়গুলো ছাড়া কৃষক জেলে ও তাঁতিরা উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম নন।

এসব ছাড়াও এ ধরনের বাণিজ্যিক কৃষিসহ সকল কৃষকদের সাধারণ সমস্যা হলো– বাজারের উপর তাদের শত্রুদের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শোষিত ও বিপদগ্রস্থ হওয়া। আমাদের দেশে বাজারকে রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে আমলা, বুর্জোয়া নেতা ও মাস্তান, ফাটকাবাজ ব্যবসায়ী, ডিলার, আড়তদার, মজুদদার, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা। ফলে কৃষক বেশি দামে কেনে, কম দামে বেচে– এতে তারা বাধ্য হয়। তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য লুণ্ঠিত হয়ে জমা হয় উপরোক্ত গণশত্রুদের পকেটে।

উৎপাদন ও বিনিময়ে এসব সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জোয়াল ছাড়াও কৃষক রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র দ্বারা, তার পুলিশ ও আমলাদের দ্বারা, কোর্ট-আদালত, ভূমি অফিস এবং গ্রাম্য সালিশে সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে শোষিত-নিপীড়িত হচ্ছেন। মাঝে মাঝেই তার জমি ও ভিটেবাড়ি রাষ্ট্র ও বড় বুর্জোয়াদের 'উন্নয়ন' প্রকল্পের স্বার্থে জোর করে কেড়ে নেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে, যার সুফলভোগী হলো সাম্রাজ্যবাদ, ভারত, বড় আমলা, মন্ত্রী এমপি চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে তাদের গ্রাম্য এজেন্ট ও দলীয় মাস্তান এবং দেশীয় বড় ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা।

তাই দেখা যাবে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণির আদি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এখন সেরকমটা দেখা না গেলেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নিপীড়ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে কৃষক ও কৃষির বিকাশকে আটকে রাখছে। যার সাথে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা, শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। প্রধান শাসকশ্রেণিরূপে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির উদ্ভব কোনো কোনো সেক্টরে পুঁজিবাদী উৎপাদন গড়ে তুললেও কৃষিতে শাসকশ্রেণির পুঁজি বিনিয়োগ সেভাবে নেই। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও শোষণ সেই পরিমাণে বিকশিত হচ্ছে না। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা কৃষককে শোষণ করছে না। বরং হাজারো ভিন্ন রূপে সেটা বজায় রয়েছে ও পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে। একে 'বিকৃত পুঁজিবাদ' বলার মধ্য দিয়ে মূলতঃ পুঁজিবাদী উৎপাদন বলাটা ভুল। এটা প্রাক পুঁজিবাদী কৃষি, যা মূলত আধা-সামন্ততান্ত্রিক, কিন্তু এটা চীন বা অতীত ভারতবর্ষের মতো আদি আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপে নেই। ভূমি-বন্টনের সমস্যা এখানে একটি বড় সমস্যা হিসেবে থাকলেও সেটাই হয়তো মূল সমস্যা নয়। বিবিধ রূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, একেক ক্ষেত্রে একেক ভাবে, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলোই কৃষির পরবর্তী বিকাশের পথে আশু ও প্রধান প্রতিবন্ধক। কৃষির সমাজতান্ত্রিক যৌথকরণের আগে কৃষক ও কৃষি এইসব সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক-মুক্ত করাটাই বিপ্লবের আশু কর্তব্য হিসেবে আসবে। এ কারণেই কৃষি পুঁজিবাদী নয়, নতুন ধরনের ও রূপের আধা-সামন্ততান্ত্রিক। বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক নয়, নয়া গণতান্ত্রিক। ৩য় কংগ্রেস একদিকে কৃষি-অর্থনীতিকে বিকৃত পুঁজিবাদী বলেছিল, অন্যদিকে বিপ্লবের স্তরকে বলেছিল নয়া গণতান্ত্রিক– যা একটি সমন্বয়বাদী বিচ্যুতির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। একইসাথে সামন্ততন্ত্রের সাথে কৃষক-জনগণের দ্বন্দ্বকে একটি

মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবে বজায় থাকা বলা, এবং পাশাপাশি কৃষিকে "বিকৃত পুঁজিবাদ"-এর মধ্যে ফেলাটাও ছিল একই ধরনের সমন্বয়বাদী বিচ্যুতি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি সমালোচনা সঠিক ছিল, যদিও সেই সমালোচনা কৃষির রূপান্তরগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে পুরনো ধারায় লাইনকে প্রকাশ করেছিল। ফলে তা প্রধান দ্বন্দ্বকেও সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি।

* আমরা এখানে কৃষির বা অর্থনীতির সামগ্রিক কোন বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নে যাচ্ছি না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটাতে পারিনি। তাই একে সম্পূর্ণ করতে হবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরো সব বিতর্কিত লাইন-প্রশ্নগুলোর সাথে যুক্তভাবে। কিন্তু ৩য় কংগ্রেসে গৃহীত ভুল সূত্রায়নটিকে আমাদের সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো আমাদের বর্তমান সূত্রায়নটি কী হবে, যখন কিনা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সূত্রায়নের পুরনো জায়গায় অর্থনীতি ও কৃষি বিরাজ করছে না। আমাদের সূত্রায়নে এই পার্থক্যকে প্রতিফলিত করা প্রয়োজন।

– এখানে কৃষি ক্ষেত্রটিকে কিছুটা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হলেও অন্য আর সব সেবা ও শিল্পক্ষেত্রগুলোতেও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবেই বিরাজমান।

হাট, বাজার, ঘাট, জলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইজারাদারী ব্যবস্থা শক্ত-পোক্তভাবেই বিরাজ করছে। এর বড় অংশে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ হলেন কৃষক এবং কৃষক-কৃষির সাথে সংযুক্ত জেলে সম্প্রদায়।

পরিবহন, হোটেল, নির্মাণ, গৃহকর্মী, হকারসহ ক্ষুদে ব্যবসা, বিবিধ কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প– সর্বত্রই ব্যাপকভাবে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো দেখা যাবে। এগুলোতে ক্ষুদে মালিকানার অংশ বিরাট। লিজ, দাদন, চাঁদাবাজী, মালিক পুলিশ ও আমলাদের বলপূর্বক ঘুষ, শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়ন ব্যাপক। চা-শিল্পের শ্রমিকেরা এখনো অর্ধ-ভূমি দাসত্বে বন্দী– যা চালু করেছিল বৃটিশ ঔপনিবেশবাদীরা– যা পুঁজিবাদের 'মুক্ত শ্রমিক'-এর পরিস্থিতি নয়। ঢাকার মত শহরগুলোতে শ্রমিক শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনগণ যে বাসাভাড়ায় থাকেন সেগুলো পরিচালিত হয় আধা-সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে। ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের দোকানগুলোও তাই। বহু বহু শ্রমক্ষেত্রে শিশুশ্রমিক নিয়োজিত, যাদের উপর চলে বর্ধিত শোষণ, কখনও কখনও যৌন-নিপীড়নও, যাকিনা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের কারণেই ঘটে চলে। লক্ষ লক্ষ গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে এটা আরও ভয়াবহভাবে প্রযোজ্য। এমনকি উন্নত যে পুঁজিবাদী শিল্প গার্মেন্ট খাত, সেখানেও মাস্তান ও পুলিশী শক্তির জোরে বেতন আটকে রাখা, ওভারটাইম মেরে দেয়া, হিসেবে গরমিল করে অর্থ-আত্মসাৎ, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করানো, টয়লেট করতে না দেয়া, যৌন নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা– ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক এখনো বিরাজমান, যার প্রধান শিকার গ্রাম

থেকে সদ্য উঠে আসা নারী শ্রমিকরা। অন্যান্য বড় শিল্পখাতগুলোতেও এ রকম সম্পর্কের দেখা মিলবে।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো যে ব্যাপকভাবে ও বিবিধ রূপে অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিরাজমান, এবং কৃষিসহ অনেক সেক্টরই যে মূলতঃ পুঁজিবাদী নয়, তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়। কিন্তু এটা পুরনো ধরনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজও নয়। এ সমাজ বিপ্লব-পূর্ব চীন ও মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা-যুগের ভারতের থেকে অনেক পৃথক, যার কিছু আলোচনা ও উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে নিয়ন্ত্রণকারী হলো আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি। একারণেই কৃষিসহ সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশও ঘটেছে। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ কম হলেও সেরকম বিকাশও কিছু পরিমাণে ঘটেছে ও ঘটে চলেছে, তা মুৎসুদ্দি ও জাতীয়– দুটোই। এই অর্থনীতিকে ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে কী নামে ডাকা উচিত সেটা একটা পর্যালোচনার বিষয়। এবং তাকে আমাদের সমাধান করতে হবে।

আপাত দৃষ্টিতে ধারণা করা যায় যে, কৃষির এই পরিস্থিতিকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলা যেতে পারে। তবে এ সম্পর্কে পার্টির অধিকতর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে এখন এই ধরনের বিকাশ পরিলক্ষিত হবে যা পুরনো ধরনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়। তাই, বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিসরে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মাঝে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দাবি রাখে। আর আমাদের প্রয়োজন এক্ষেত্রে নমনীয় অবস্থান বজায় রাখা। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে চূড়ান্ত করার আগে আরো অধ্যয়ন-গবেষণার মধ্য দিয়ে যাওয়া।

এই অন্তর্বর্তীকালে রাজনৈতিক লাইন ও কর্মসূচিতে মীমাংসিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে আমরা কাজ এগিয়ে নিতে পারি এবং সেসবের ভিত্তিতে পরবর্তী অমীমাংসিত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা বিকশিত করতে পারি। এক্ষেত্রে নতুন থিসিসে আমাদের রাজনৈতিক লাইন ও কর্মসূচির সেসব বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে অব্যাহত রাখতে হবে। যার মূল কয়েকটি দিক হলো– আমাদের দেশটি সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি নয়া-উপনিবেশিক দেশ, যেখানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শত্রু হিসেবে ভূমিকা রাখে। যেখানে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি বিকাশমান, এবং এটিই হলো প্রধান/মূল শাসকশ্রেণি। এই শ্রেণির সাথে কৃষক-শ্রমিক-দরিদ্র-শ্রমজীবী-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের শ্রেণি-দ্বন্দ্বটি হলো প্রধান দ্বন্দ্ব। তাই বিপ্লবী যুদ্ধটি হলো একটি গৃহযুদ্ধ। কৃষিসহ অর্থনীতির সকল সেক্টরেই পুরাতন ও নতুন রূপে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো বিরাজমান, যাকে আত্মীকরণ ও রক্ষা করছে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র– যদিও সর্বত্রই, কৃষিসহ, পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। বিপ্লবের স্তর হলো নয়া গণতান্ত্রিক। কৃষি-বিপ্লব হলো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ, যার একটি মৌলিক বিষয় হলো "খোদ কৃষকের হাতে কৃষি-

জমি"– এই নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি-সংস্কার। গ্রাম হলো বিপ্লবী কাজের প্রধান ক্ষেত্র, কৃষক হলো প্রধান শক্তি, যদিও বিকাশমান নগরগুলোতে শ্রমিক-শ্রমজীবী-দরিদ্র জনগণের মধ্যকার কাজকেও খুবই গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করতে হবে। গ্রাম ও কৃষক-ভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মাধ্যমে রণনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাগুলো মুক্ত করা, মুক্ত গ্রামাঞ্চল দিয়ে শহর ঘেরাও করা, এবং শেষে শহরের ক্ষমতা দখল করা– এই হলো বিপ্লবের মৌলিক পথ। যদিও শহরাঞ্চলে গণসংগ্রাম ও অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি-কাজকেও যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে করে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নগর-কেন্দ্রীক সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে গ্রাম-কেন্দ্রীক সংগ্রামের সাথে সমন্বিত করা যায়।

সামরিক লাইন ঃ

সামরিক লাইনের ক্ষেত্রেও ৩য় কংগ্রেস আমাদের পার্টির ও এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের একটি ঐতিহ্যিক ধারায় পরিবর্তন ঘটায়।

এদেশের মাওবাদী আন্দোলন ষাট-সত্তর দশকে তার সূচনাকালে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে কমরেড চারু মজুমদারের প্রণীত "খতম লাইন"-কে গ্রহণ করেছিল। "খতম লাইন"-টি ছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে গণযুদ্ধ/গেরিলা যুদ্ধ সূচনার একটি লাইন। আমাদের পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের একেবারে শুরুতে শহরাঞ্চলে ধ্বংসাত্মক হামলার মধ্য দিয়ে গণযুদ্ধের সূচনা করলেও শিগগিরই গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার জন্য "খতম লাইন" গ্রহণ করে নিয়েছিল। এদেশে "খতম লাইন"টি গ্রহণ ও প্রয়োগে তৎকালীন বিভিন্ন মাওবাদী ধারার মধ্যে বিবিধ পার্থক্য ছিল। তাসত্ত্বেও এটা বলা চলে যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার ক্ষেত্রে এ লাইনটিই ছিল তৎকালীন মৌলিক লাইন।

'৭১-সালের জাতিগত যুদ্ধের কালে মাওবাদীদের দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রামের ভিন্ন মাত্রা বিকশিত হয়। গণযুদ্ধের উচ্চতর অভিজ্ঞতা দ্বারা আন্দোলন সমৃদ্ধ হয়। '৭১-সালের পর আমাদের পার্টি কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গণযুদ্ধের ক্ষেত্রে খতম লাইনকে ছাড়িয়ে সৃজনশীল বিকাশ ঘটায়। কিন্তু এটা বলা চলে যে, আমাদের পার্টিতে খতম লাইনটি বজায় ছিল, এবং দুর্বল অবস্থায় এ লাইন দ্বারা আমরা বিভিন্ন এলাকায় বারংবার সশস্ত্র সংগ্রামকে শুরু করি ও এগিয়ে নেই।

– গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার ক্ষেত্রে খতম লাইন ঐতিহাসিক ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও এ লাইনে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও ছিল। যা পরে বিবিধ বিচ্যুতি গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে। ৩য় কংগ্রেস এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে বিপ্লবী অবস্থান থেকে প্রথম খতম লাইনের সারসংকলন করে। কংগ্রেস-প্রস্তাব বলে

যে, শুরু থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামকে রাষ্ট্রযন্ত্র, তথা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ বিকশিত করতে হবে। এটা ছিল সামরিক লাইনের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এটা সশস্ত্র সংস্কারবাদ ও সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ প্রশ্নে পার্টিতে একটি সচেতনতা গড়ে তোলা শুরু করে এবং পার্টির বিপ্লবী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকশিত করতে বড় অবদান রাখে।

– কিন্তু কংগ্রেস নতুন সামরিক লাইনের একটি সামগ্রিক রূপরেখা পেশ করতে ব্যর্থ হয়। দুর্বল অবস্থায় শুরুতেই রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সূচনাতেই নিয়মিত গেরিলাদল গড়ে তোলাটাও আমাদের মতো সমভূমির জনবহুল দেশে সাধারণভাবে ঘটেনা। এগুলোর প্রেক্ষিতকে কেন্দ্রে রেখে যুদ্ধ শুরু করা, আর শুরুতেই তেমন লড়াই ও সংগঠন বাস্তবেই করা দুটো ভিন্ন বিষয়। সুতরাং কংগ্রেস-পরবর্তীতে নতুন রণনৈতিক পরিকল্পনায় এই নতুন দিশায় যুদ্ধ বিকাশ করতে যখন আমাদের প্রতিকূলতা আসে ও সময় ক্ষেপণ হয়, তখন তার সমাধান হিসেবে যুদ্ধ-পূর্ব একটি "সস পর্যায়" আনা হয়, যাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি বলা হবে, নাকি যুদ্ধেরই অংশ বলা হবে তা নিয়ে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিতে পার্টি নিক্ষিপ্ত হয়। রক্তপাতময় রাজনীতি যে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়, এই মাওবাদী তাত্ত্বিক দিশাটি চাপা পড়ে এমনসব কুটতর্কে যে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই বাদে অন্যসব সশস্ত্র সংগ্রাম প্রকৃত যুদ্ধ নয়। এটা পার্টিতে যুদ্ধ প্রশ্নে বড় ধরনের অপ-বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং পরিণতিতে আরো সব ইস্যুর সাথে মিলে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সার্বিক একটি সামরিক লাইন উপস্থাপন করতে সিসিসহ বিতর্করত সকল পক্ষই ব্যর্থতার পরিচয় দেয় এবং পার্টি তত্ত্বগতভাবে এবং ঐক্যের ক্ষেত্রে এক বড় সংকটের জন্ম দেয়।

নতুন থিসিস এ বিষয়ে সারসংকলন করে, আমাদের ভুলগুলোকেও উদ্ঘাটন করে এবং একটি সার্বিক সামরিক লাইনের দিকে পুনঃঅগ্রগতির সূচনা করে।

সুতরাং এটা বলা চলে যে, ৩য় কংগ্রেস খতম লাইনের দুর্বলতা ও অন্তর্নিহিত বিচ্যুতি থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটালেও তা একটি সার্বিক সামরিক লাইন পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং খতম লাইনের সারসংকলন অসম্পূর্ণ ছিল, তাত্ত্বিক ও বাস্তব সামরিক কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণে অস্পষ্টতা ছিল এবং পরবর্তী ভুলের দিকে বিকাশের পথ খুলে রেখেছিল।

তাই, সামরিক লাইনের প্রশ্নে খতম লাইনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার গুরুত্বকে বজায় রাখার পাশাপাশি ৩য় কংগ্রেসের ত্রুটি সম্পর্কেও স্পষ্ট থাকতে হবে। নতুন থিসিস এই অগ্রসর চেতনাগুলোকে সূত্রবদ্ধ করেছে। তাকে ভিত্তি করেই সামরিক লাইন গড়ে তোলার কাজটিকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে।

(৬)

বিগত সময়ে আমাদের কার্যক্রম আমাদের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়

২০১১ সালের সম্মেলনে নতুন থিসিস দলিলের মাধ্যমে ৩য় কংগ্রেস পরবর্তীকালের লাইনগত ভূমিকা, বিকাশ ও আমাদের কার্যক্রমকে তুলে ধরা হয়েছিল। সুতরাং বিগত সুদীর্ঘ সময়ের বিবরণ না এনে এখানে ২০১১ পরবর্তীতে গৃহীত রণনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ, তার বাস্তবায়ন ও আমাদের বর্তমান আত্মগত অবস্থার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। তবে তা করতে হলে একটু আগে থেকেই কথা টানতে হবে।

কমরেডগণ জানেন যে, মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি পর্বে, ১৯৭৩–৭৪ সালে দেশব্যাপী মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হিসেবে কমরেড এসএস-এর নেতৃত্বে আমাদের পার্টির সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রীয় দমনে এবং আন্দোলনের নিজস্ব ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সে সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। '৭৫-এর ২ জানুয়ারি কমরেড এসএস-এর গ্রেফতার ও শহীদি মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ঐ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। পার্টি বিপর্যস্ত হয়ে যায়, বিভক্ত হয়ে পড়ে, যার থেকে কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে '৮০-র দশকে পার্টি বেরিয়ে আসে এবং দেশব্যাপী পুনরায় এক উত্থান ঘটায়। কিন্তু এ সংগ্রামও বিপর্যস্ত হয়ে যায় '৮৮ ও '৮৯-সালে সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের রাষ্ট্রীয় দমন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। এই দুই পর্বের লাইনগত সারসংকলনকে নিয়েই ১৯৯২ সালে পার্টির ৩য় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু যেমনটা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংগ্রেস লাইন নিয়ে বিরাটাকারের দুই লাইনের সংগ্রামের মুখে পার্টি ১৯৯৮/৯৯ সালে বড় তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। একে কাটিয়ে তোলার প্রক্রিয়ায় একদিকে লাইনগত সারসংকলন ও অগ্রগতি, অন্যদিকে বাস্তব সংগ্রামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে পার্টিকে খুবই কঠিন এক পথ পাড়ি দিতে হয়। পার্টি পুনরায় অগ্রগতি ঘটাতে শুরু করে। আন্তর্জাতিকভাবেও নেপাল বিপ্লবের অগ্রগতি, ভারতে মাওবাদী আন্দোলনের বিকাশ, কমপোসা গঠন প্রভৃতি আমাদের দেশের সংগ্রাম ও পরিস্থিতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কিন্তু নেপালের পার্টি-নেতৃত্বের সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতা, ফলত কমপোসার বিলুপ্তি, রিমের বিভক্তি, আরসিপি'র নিউ সিনথিসিস-এর মধ্য দিয়ে সৃষ্ট তাত্ত্বিক জটিলতা, ভারতের সংগ্রামে বড় বড় ক্ষয়ক্ষতি–

এইসব নেতিবাচক বিকাশ আমাদের সংগ্রাম ও সংগঠনকেও বড় আকারে প্রভাবিত করে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় দমনে দেশের মাওবাদী শক্তিগুলোর বড় বড় বিপর্যয় ও ক্ষতি, বিশ্ব রাজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের জায়গায় ধর্মীয় জঙ্গি মৌলবাদের বিকাশ, মৌলবাদের জুজু দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশে তাদের দালাল শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বেশি বেশি ফ্যাসিকরণ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর (এবং সাধারণভাবে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে) বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমাদের পার্টিকে এই সমগ্র প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোকে মোকাবেলা করেই এখন এগোতে হচ্ছে।

* ২০১১ সালের সম্মেলন নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বদের সহকারে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করেছিল। এবং একটি রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, যার স্লোগান ছিল– "গণযুদ্ধের চলমান প্রবাহকে রক্ষা কর, বিস্তৃত কর, এবং উচ্চতর স্তরে তাকে উন্নীত কর।"

– নেতৃত্বের বিষয়টাতে পৃথক এজেন্ডায় কংগ্রেস সুনির্দিষ্টভাবে কিছু আলোচনা করবে, যা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় হবে। এখানে সংক্ষেপে আমাদের নেতৃত্ব স্তরের দুর্বলতাগুলোর কিছু উল্লেখ প্রয়োজন।

... ...

... ...

আমাদের নেতৃত্বের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই কিছু প্রবীণ নেতৃত্ব আর পূর্বের মত কর্মক্ষম নন। কিন্তু যতটা তারা করতে পারেন তাতেও দুর্বলতা রয়েছে যা কাটানো সম্ভব ও উচিত। শুধু সারা জীবন বিপ্লবে লেগে থাকলেই ততটা ভাল নয়, লেগে থাকাটা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে হবে। তবে প্রবীণদের থেকে পরিবর্তনের খুব বড় আশা না করে নবীন নেতৃত্ব গড়ার উপরেই আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিটি পার্টি সদস্য বা সংগঠক কেডারদেরকে নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে ওঠায় ও গড়ে তোলায় মনোযোগী হতে হবে। বিভিন্ন স্তরের সংগঠক কেডারদের মধ্য থেকেই পরবর্তীতে নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব টেনে তুলতে হবে।

নেতৃত্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকে মালেমা-তে শিক্ষিত ও নিজেকে পুনর্গঠিত হওয়ার জন্য আজীবন নিজের সাথে সংগ্রাম করে যেতে হবে। আজীবন সর্বহারা শ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। বিশ্ব কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও আমাদের পার্টির সংকটের কারণে, পার্টির বিভক্তি ও অনেকের শহীদ হওয়া, মৃত্যু ঘটা ও ঝরে পড়ার কারণে নবীন বা কম মান সম্পন্ন অনেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হয়েছেন। এতে নিজেদের লেজ ফুলিয়ে আকাশে না

তুলে রাজনৈতিক জ্ঞান, তাত্ত্বিক মান ও বাস্তব সংগঠন-সংগ্রামের চড়াই উৎরাই ও অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার উপর তাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষকের সাথে একাত্ম হতে হবে। জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জগত থেকে রাপচার ঘটাতে হবে। নারী প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা, এবং বাস্তবেও তাকে প্রয়োগ করায় মনোযোগী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রেও আমাদের সমস্যা রয়েছে।

নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্মপর্যালোচনায় মনোযোগী হওয়া যাতে নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটিকে বোঝা যায় ও আন্তরিকভাবে তা কাটানোর উপর প্রয়াশ চালানো যায়। আত্ম-পর্যালোচনার সূচনা হাতিয়ার হলো আত্মসমালোচনার প্রতি সঠিক মনোভাব। এক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বদের গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের সমাজ ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদনের সমাজ– যেখানে মানুষ অনবরত নিজেকে ডিফেণ্ড করা শেখে। তাছাড়া তারা আত্মরক্ষা করতে পারে না। তা থেকে আমাদের কেডারদের মাঝে আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস দেখা দেয়। এক কথায় আমাদের নেতৃত্বদের প্রয়োজন আত্মসমালোচনা শেখা ও রপ্ত করা। একইসাথে আত্মপর্যালোচনা কাউকে কাউকে নীরবে হীনমন্য করে তোলে সে সম্বন্ধেও লক্ষ রাখতে হবে। দুটো সমস্যাই আত্মকেন্দ্রীকতা উদ্ভূত।

আমাদের নেতৃত্বদের তত্ত্বগত অধ্যয়ন দুর্বল। যারা কিছুটা অধ্যয়নে মনোযোগী তারা দৈনন্দিন ও চলতি অধ্যয়নে যতটা সক্রিয়, ক্লাসিকাল মালেমা'র অধ্যয়নে ততটা উদ্যোগী নন। আরো যা মারাত্মক, কেউ কেউ রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা বিকাশে ও অর্জনেও মোটেই মনোযোগী নন। অথচ তারা রাজনৈতিক পার্টিরই নেতৃত্ব। এভাবে গুরুতর অভিজ্ঞতাবাদী সমস্যাও আমাদের রয়েছে।

অন্যদিকে যারা কিছুটা তাত্ত্বিক অধ্যয়নে মনোযোগী তাদের কেউ কেউ অধ্যয়নটাকেই প্রকৃত মজা মনে করেন। বাস্তব বিচ্ছিন্ন বই পুজার বৈশিষ্ট তাদেরকে গোড়ামীবাদে পরিচালিত করে।

শুধু মার্কসবাদী ক্লাসিক অধ্যয়নেই তাত্ত্বিক মান এগোয়না, যদিনা তার সাথে বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি ও বিষয়গত ধারণার জ্ঞানকে বাড়ানো যায়।

আমাদের নেতৃত্বরা মূলত জনগণের সাথেই থাকেন, কিন্তু তাদের অনেকেই জনগণের থেকে খুব কম শেখেন। জনগণ, নিম্নস্তর, প্রগতিশীল মানুষ ও পরিবেশ থেকে নিজস্ব উদ্যোগে শেখাই হলো প্রধান শিক্ষা। বই পড়ে, পার্টির দলিল পড়ে আসল শিক্ষাটা অসম্পূর্ণই থাকে।

জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রশ্নে আমাদের নেতৃত্ব ও কেডারদের মাঝে আমলাতান্ত্রিকতা ও বিনয়ের অভাব প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত নিম্নস্তরের কেডার ও জনগণের সাথে বহু সময়েই আমাদের বহু নেতৃত্বেরই আচরণে খারাপ ধরনের আমলাতান্ত্রিকতার প্রকাশ দেখা যায়।

নেতৃত্বের দরকার মাওয়ের ভাষায় পিয়ানো বাজানো শেখা। এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হলো, হয় সব কাজেই দৌড়ানোর মাধ্যমে বুড়ো আঙুলের কাজ, অর্থাৎ মূল কাজকে আঁকড়ে ধরায় দুর্বলতা। নতুবা সবগুলো আঙুলের ব্যবহার করতে না পারা, অর্থাৎ, একটি কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ না করা, এবং পরে সেগুলো ভুলে যাওয়া বা নতুন কাজের ভিড়ে সেগুলো হারিয়ে যাওয়া।

আমাদের দেশের ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদন থেকে অধিকাংশ নেতৃত্ব আসার কারণে তারা অল্পতে তুষ্ট। আত্মতৃপ্ত। বৃহৎ ও উচ্চ লক্ষ তাদের সামনে থাকে না।

পরিকল্পিতভাবে কাজ করা এবং নৈরাজ্যিক কর্মপদ্ধতিকে বর্জন করা প্রয়োজন। নতুবা স্বতঃস্ফূর্ততাবাদ বিকশিত হয়, যা আমাদের কমরেডদের বিকাশকে ক্ষতি করে। সময়কে আঁকড়ে ধরে কাজ করা প্রয়োজন যাতে পরিকল্পনা শুধু কথার কথা হয়ে না থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্ব ও কেডারদের সমস্যা রয়েছে।

প্রবীণ নেতৃত্বদের দায়িত্ব হলো নবীনদের গড়ে তোলা, তাদের অভিভাবক হওয়া। তাদেরকে শুধু সমালোচনা করা, ধমকা ধমকি করা বা এমনকি গালাগালি করা, আমলাতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে চালানো, অবিরত তাদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো নিয়ে আলোচনা করা নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক বড় প্রতিবন্ধক।

প্রবীণদের দায়িত্ব হলো নবীনদেরকে তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি সাংগঠনিক ও সামরিক পদ্ধতিগত বিষয়গুলোতে শিক্ষিত করা, বিতর্ক করা ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে শেখানো, রিপোর্ট নিতে ও দিতে শেখানো। নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

নতুন নেতৃত্বদের দরকার শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী হওয়া, আজীবন লেগে থাকার মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরা, আত্মবলিদানের মতাদর্শকে শক্তিশালী করা, ব্যক্তিগত পারিবারিক গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে মুক্ত হওয়া, তাকে বিসর্জন দেয়ার মতাদর্শ অর্জন করা। তাদের প্রয়োজন প্রবীণ নেতৃত্বদের ত্যাগ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে শিক্ষা নেয়া, কিন্তু তাদের দুর্বল জায়গাগুলোকে অনুসরণ না করা। তাদের প্রয়োজন নতুন পার্টির উচ্চতর লাইনে সজ্জিত নতুন ধরনের নেতৃত্ব হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলা।

তরুণ নেতৃত্বদের ক্ষেত্রে প্রেম-বিয়ে-যৌন ও বাবা-মা-পরিবার একটি বাস্তব সমস্যা হিসেবে আসে। একে দোষের হিসেবে দেখার কিছু নেই। কিন্তু পার্টি, জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থে এই ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করা, সেসবের অধীনে তাকে রাখা এবং কখনো তার কাছে আত্মসমর্পণ করে পার্টি-বিপ্লব ত্যাগ না করা। প্রেম-যৌন প্রশ্নে ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করতে না পেরে বহু বহু সম্ভাবনাময় তরুণ নেতৃত্ব তাদের বিপ্লবী জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

* বস্তুত সম্মেলনের পর গণযুদ্ধের ক্ষীণ প্রবাহটিকে আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হলেও তাকে খুব একটা বিস্তৃত করা যায়নি এবং তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীতও করা

যায়নি। আগেই বলা হয়েছে সংগঠকের ও নেতৃত্বের অভাব এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। যা ইঙ্গিত করে যে, আমাদের পার্টি-গঠনের কাজকে শক্তিশালী করা এবং পেশাদার বিপ্লবী টেনে আনাটা গণযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার জন্যও কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

... ...

... ...

– পার্টি বাহিনী ও ফ্রন্ট গঠনের কাজে সুসমন্বিত বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যিক ত্রুটি এখনো কাটেনি। কোথাও পার্টি-কাজ দুর্বল, কোথাও কর্মসূচিকে ভালভাবে উদ্ঘাটন ও প্রচারের কাজে গুরুত্ব আসছে না, গণসংগঠন গড়ায় গুরুত্ব নেই, কোথাওবা সেগুলোর উপর জোর প্রদানের কথা বলে বাহিনী ও যুদ্ধের বিকাশের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে না।

– পার্টি শক্তিশালী না হলে গণযুদ্ধ বিকাশ হবে না, আবার যুদ্ধ ছাড়া পার্টির বিকাশ হবে না– এই ডিলেমা কাজ করছে। পার্টি গঠন প্রধান কাজ, না যুদ্ধ বিকাশ?

এছাড়াও আরো ডিলেমা রয়েছে। নিগেদ-ভিত্তিক কাজ, নাকি তা না করে কাজ?

অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন আছে, নাকি তা পর্যাপ্ত বা বেশি রয়েছে? অর্থাৎ আগে লোক তৈরি, নাকি আগে অস্ত্র সংগ্রহ?

গণফ্রন্টের কাজ কোথায় হবে বা না হবে তার নীতি নির্ধারণেও সমস্যা কাটেনি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোতে লাইনের সচেতনতা ও সঠিক প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। তা না কাটিয়ে গণযুদ্ধের বিকাশ করা যাবে না।

– সামরিক প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরে তাকে কেন্দ্র করে পার্টি গঠন, ফ্রন্ট গঠন, ক্ষমতা দখল-কর্মসূচি বাস্তবায়ন আবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োগগত সমস্যা সামরিক লাইনগত দুর্বলতা গড়ে তোলে ও তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এমনকি তা রাজনৈতিক লাইনগত বিচ্যুতি আকারেও গড়ে উঠতে পারে। এ সম্পর্কে খুবই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সামরিক প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা, উল্লম্ফনের প্রশ্নকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা ও সামরিক এলাকার বিস্তারকে আঁকড়ে না ধরলে গণযুদ্ধ কখনই বিকশিত হবে না।

... ...

... ...

* আগে যে ডিলেমাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেসব বিষয়ে সমন্বয়বাদী চেতনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

– পার্টি ছাড়া যুদ্ধ হয় না, আবার যুদ্ধ ছাড়া পার্টি গড়া যাবে না– এ দুটোই সত্য। কিন্তু যুদ্ধকে আঁকড়ে না ধরলে উপরোক্ত দুটো সত্যের ধারণা সমন্বয়বাদকে বিকশিত করবে। যা যুদ্ধ বিকাশকে পার্টি-গঠনের একতরফা চেতনার উপর ভুলভাবে

নির্ভরশীল করে তুলবে। এ ধরনের বিচ্যুতিপূর্ণ চেতনা ও অনুশীলন আমাদের বিকাশকে দুর্বল করছে। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের কেউ কেউ পার্টি-গঠন বা গণসংগঠনের কর্মসূচি/কাজগুলো নিয়ে যতটা নিয়োজিত থাকেন, ততটা তারা যুদ্ধ প্রশ্নে থাকেন না। এটা সত্য যে, যুদ্ধ এখনো বড় কাজ হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাকে বড় কাজ হয়ে উঠতে হলে মনোযোগ ও নিয়োজিত হবার ভারকেন্দ্রকে বদলাতে হবে।

একই কথা প্রযোজ্য কর্মসূচি ও ফ্রন্ট প্রশ্নেও। কর্মসূচি বাস্তবায়নকে এই স্তরে যুদ্ধের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। আর সেভাবেই তাকে পরিচালনা করতে হবে। কর্মসূচি/ক্ষমতা ও গণসংগঠন/ফ্রন্ট ছাড়া গণযুদ্ধ আগাবে না। আবার গণযুদ্ধ ছাড়া কর্মসূচি/ক্ষমতা ও গণসংগঠন/ফ্রন্ট বিকশিত হবে না। এ দুটোই সত্য। কিন্তু যুদ্ধকে কেন্দ্রীয় কাজ করতে হবে। নতুবা কর্মসূচি ও গণসংগঠনের কথা আমরা বললেও বেশি আকারে তা করতে পারবো না।

... ...

... ...

* যুদ্ধের বিষয়টি ছাড়াও পার্টির সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় আমাদের রয়েছে।

লাইন-বিনির্মাণ, পার্টি-গঠন, ফ্রন্ট কাজকে বিকশিত করা, "আন্তর্জাতিক" গঠনে ভূমিকা রাখার মতো সবগুলো কাজকেই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, মাও যাকে পিয়ানো বাজানো বলেছেন সেভাবে।

সাংগঠনিক কাজে সর্বক্ষেত্রেই পার্টি-গঠনকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আঁকড়ে ধরতে হবে। পার্টি-গঠনের একটি প্রধানতম বিষয় হলো বেশি বেশি পেশাদার বিপ্লবী বের করা। গণসংগঠন ও গণভিত্তির মাঝে পার্টি-সদস্য, পার্টি-সেল, পার্টি-শাখা ও পার্টি-কমিটি গড়ে তোলায় সর্বদা জোর দেয়া উচিত। পার্টি হলো সেনাপতি মণ্ডলী– যা সকল ফ্রন্টের কাজগুলোকে একটি কেন্দ্র থেকে, একটি পরিকল্পনার আওতায় পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে আমাদের পার্টি মূলত সঠিকভাবে কাজ করলেও সংগঠক কমরেডদের মাঝে এবং নবীন কমরেডদের মাঝে এর সচেতনতায় ঘাটতি দেখা যায়। যারা পার্টি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কাজ গণযুদ্ধ'র সাথে গণসংগঠনগুলোর সম্পর্ককে সঠিকভাবে ধারণ ও প্রয়োগ করতে পারেন না। যা কাটানোর উপর মনোযোগ দিতে হবে।

পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে আন্তরিক মাওবাদীদের ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলনের পর নতুন থিসিসকে ভিত্তি করে মাওবাদীদের ঐক্যের প্রচেষ্টাকে আমরা জোরদার করি। কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্যান্য কেন্দ্রগুলো বিলুপ্ত, প্রায় বিলুপ্ত বা রাজনৈতিকভাবে খুবই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। ফলে আমাদের সে প্রচেষ্টায় তেমন কোন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। এমবিআরএম-এর সাথে যদিও আমাদের একটি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তারা তাদের পুরনো ধারাই অনুসরণ

করে চলে এবং আমাদের নতুন থিসিস ও আহ্বানের রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। তবে সংগঠনগতভাবে না হলেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্য-প্রচেষ্টা ফল দিয়েছে। আমরা বেশ কিছু নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি, যা পার্টি-গত ঐক্যের অগ্রগতি ঘটিয়েছে। আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যদিও সংগঠনগতভাবে তার সম্ভাবনা এখন খুবই ক্ষীণ মনে হয়। কিন্তু এর লাইনগত তাৎপর্য ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। যা ব্যক্তি পর্যায়ে ঐক্যকে এগিয়ে দেবে, এবং সংগঠনগত ঐক্যের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

ছাত্র-বুদ্ধিজীবী কর্মীদেরকে শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্রদের মধ্যে নিয়োজিত হতে পরিচালিত করতে হবে। তাদেরকে মূল শ্রেণির মাঝে সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের ভিত্তিতে সংগঠন গড়ার উপর জোর দিতে হবে। প্রধান দ্বন্দ্ব, গণবিপ্লব ও আশু সংগ্রামের বিষয়কে কমিউনিস্ট চেতনার অধীনে রাখতে হবে। তাতে শুধু মূল শ্রেণির মাঝে আমাদের সংগঠন গড়ে উঠবে তা নয়, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী আন্তরিক বিপ্লবীরাও প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে উঠবেন। নতুবা সব ধরনের ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সক্রিয়তাই শেষ পর্যন্ত বিফলে যাবে। সংশোধনবাদী বামরা ছাত্র-তরুণ-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে যা করে সেটাই ঘটবে।

শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে না চালিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষে, গণঅভ্যুত্থানের লক্ষে পরিকল্পিত গুরুত্বক্রমে আঁকড়ে ধরতে হবে। দেশের প্রায় সকল শিল্প সেক্টরের অধিকাংশ শ্রমিক এখনো গ্রাম ও কৃষির সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। তাই গ্রাম-ভিত্তিক গণযুদ্ধের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। তবে বড় নগর-কেন্দ্রীক শ্রমিক সেক্টরে ভবিষ্যতের অভ্যুত্থানকে লক্ষ করেও প্রথম থেকেই কাজ গড়ে তুলতে হবে। এসব ক্ষেত্রে গার্মেন্ট, সড়ক ও নৌ পরিবহন সবচেয়ে বিকাশমান সেক্টর এবং/অথবা রাষ্ট্রের জন্য খুব নির্ধারক খাত যা দ্রুতই পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এসব জায়গায় ইউনিয়ন আন্দোলনকেও গুরুত্ব দিতে হবে, যার মধ্য দিয়ে আমরা পার্টি-ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি। অন্যান্য শিল্প, রেল, চা-শিল্প আসবে পরবর্তী গুরুত্বে। রিক্সা, হোটেল, হকার, নির্মাণ, ফেরিওয়ালা এমনসব অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের রয়েছে গ্রামের/কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গ্রামের গণযুদ্ধের বিকাশের সাথে এ সেক্টরগুলোর গুরুত্ব আসবে। সুতরাং নগর ও শহরের কাজে এ বিষয়গুলোতে সচেতন থেকে সাংগঠনিক কাজের পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ করতে হবে।

পার্টির পুরনো প্রজন্মের নেতৃত্বদের বয়সজনিত সমস্যাবলীকে উপলব্ধি করে তাদেরকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ, তাদের বিশ্রাম ও চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা দরকার। আর দরকার হলো নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপর বিশেষ মনোযোগ দান। এজন্য জনে জনে আঁকড়ে ধরে প্রাথমিক মানোন্নয়ন, দায়িত্বদান, সমালোচনা সংগ্রাম ও শিক্ষিতকরণ, পদোন্নতির উপর জোর দিতে হবে। অনেক পুরনো

নেতৃত্বই নতুনদের পদোন্নতিদানের ক্ষেত্রে কৃপণ এবং সাহসী নন। সমালোচনা ও অবমূল্যায়নে পটু কিন্তু মানোন্নয়নে যত্নবান নন। শুধুই প্রয়োগগত গাইড দেন, অথবা শুধুই তত্ত্বগত-রাজনৈতিক আলোচনা করেন, যেখানে দুটোরই সমন্বয় প্রয়োজন।

পার্টি ও ফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও নারীদের মধ্যে কাজকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সর্বদা দেয়া হয় না। নারী প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি দেখা যায়, এমনকি কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরেও। এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের মাঝে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের গুরুত্বকে সামনে রাখতে হবে।

যুক্তফ্রন্টের কাজে গ্রামাঞ্চলে গণসংগঠন গড়ার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এতে আমাদের দুর্বলতা এখনো কাটেনি।

যুক্তফ্রন্টের কাজের ক্ষেত্রে বিবিধ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন। এ ধরনের ব্যক্তিরা পার্টিজান হতে অনেকেই সক্ষম নন, কিন্তু বিপ্লবে ও জনগণের স্বার্থে তারা বহু অবদান রাখতে সক্ষম। তাই, একরোখা পার্টি-বিরোধীরা বাদে অন্যসব প্রগতিশীল বামমনা বিজ্ঞানমনস্ক জনমুখী আন্তরিক ও সৎ বুদ্ধিজীবীদের সাথে, তারা যে পার্টিতেই যুক্ত থাকুন না কেন বা যে রাজনৈতিক ধারাই সমর্থন করুন না কেন, ঐক্য ও সমালোচনা-সংগ্রামের সম্পর্ক রক্ষায় দক্ষ হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে পার্টির প্রতি সমালোচনা হতাশা নেতিবাদকে হজম করার মানসিকতা পার্টি-কর্মীদের থাকতে হবে।

গণফ্রন্টে তুলনামূলক স্থায়ী জোট গঠন বা যুগপৎ কাজের গুরুত্বকে আমরা সর্বদাই বজায় রেখেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আজকের পরিস্থিতিতে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মাঝে গুরুতর সংকীর্ণতা, বিভেদ, সংশোধনবাদের প্রভাব, বিশেষত নিজেদের লাইন ও কর্মসূচিকে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমে 'কৌশলে' চাপিয়ে দেয়ার লাইন প্রভৃতি কারণে এখনই সে বিষয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া যায় না। এগুলো গড়বে ভাঙবে আবার গড়বে; সক্রিয় থাকবে থিতিয়ে পড়বে আবার সক্রিয় হবে; সম্পর্ক উষ্ণ থাকবে ফাটল ধরবে আবার এগিয়ে যাবে– এভাবেই বিকশিত হবে। কিন্তু কোন চলতি সমস্যার সূত্র ধরে চট্ করে এ ধরনের সম্পর্ক ও সমঝোতাগুলো থেকে আমাদের সরে আসলে চলবে না। একইসাথে খুব বড় কিছু আশা করে থাকলেও চলবে না। বর্তমানেও এক্ষেত্রে আমাদের সমঝোতা খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু সামগ্রিক স্বার্থে একে আমাদের ধরে রাখতে হবে এবং এগিয়ে নিতে হবে। যতটা বেশি তা থেকে ফল আসে সেই লক্ষ নিয়ে। সংগ্রাম ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে সেই ফলকে বিকশিত করতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

গণফ্রন্টে তুলনামূলক স্থায়ী জোট আর যুগপৎ কাজের গুরুত্ব সত্ত্বেও সবক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব কাজের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ব্যাপক নমনীয়তার সাথে সাথে নীতিগত প্রশ্নাবলীতে আমাদের সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামকে ঢিলে করলে

চলবে না। এর মধ্য দিয়ে মাওবাদের সঠিকতা প্রতিষ্ঠাকে সামনে আনতে হবে। বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদের দেউলিয়াত্ব উন্মোচন করতে হবে এবং আন্তরিক বিপ্লবী ও আন্তরিক কমিউনিস্টদেরকে পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে হবে।

গণফ্রন্টের কাজে পার্টি-গঠনের মূর্ত রূপ হিসেবে পেশাদার টানার উপর গুরুত্ব দান, শ্রমিক ও শ্রমজীবীদেরকে প্রাধান্যদান এবং গ্রামে চলো কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন সংগ্রামে গুরুত্ব দিতে অবশ্যই হবে, কিন্তু তা যেন পার্টির মূল কাজের থেকে মনোযোগ সরিয়ে না দেয়।

রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে তিন ধরনের কাজ আমাদের রয়েছে, এবং যুগপৎ সেগুলো করতে হবে– সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের কাজ, চলতি বিপ্লবের কাজ, এবং দৈনন্দিন বা আশু কাজ। এই তিনের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার যে ব্রত সেই ভিত্তিকে ঠিক রেখে এই সমন্বয় করতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণি ও শহুরে দরিদ্রদের বিরাট বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বড় নগরগুলোকে আঁকড়ে ধরে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠন গড়ার কাজ আমাদের খুবই দুর্বল। একে কাটানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

... ...

... ...

– আমাদের সকল নেতৃত্ব কেডার ও শাখা পত্র-পত্রিকা বইপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে এবং বিক্রিলব্ধ অর্থ জমাদানের ক্ষেত্রে ভাল নন। প্রয়োজনীয় চলতি রিপোর্ট-দানের ক্ষেত্রে ভাল নন। অনেকে কমিটি-বৈঠকের নোটও সঠিকভাবে করেন না এবং প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে জমা দেন না। এসব সমস্যা কাটানোর উপর জোর দিতে হবে।

– অর্থ-ব্যবস্থাপনা একটি বড় সমস্যা হিসেবে পার্টিতে রয়ে গেছে, যার উপর সকল নেতৃত্ব ও সংগঠকগণ সঠিক মাত্রায় সচেতন নন। বহু ... ... কাজে ... ... বিরাট অর্থের প্রয়োজনকে অনেক কমরেড আদৌ বোঝেনই না। অনেকের অবস্থাটা এমন যে নিজেরা শুধু পেটে-ভাতে চলতে পারলেই হলো। সমস্ত পার্টিকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা দরকার। নবীন প্রজন্মকে বিপ্লবের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতায় শিক্ষিত করতে হবে। শ্রম ও পেশা আয়ের সুযোগ নিতে হবে। যেখানেই সম্ভব সেখানেই ব্যক্তিগত সম্পদকে পার্টি-বিপ্লবের ফান্ডে জমাদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পার্টির কর্মী-সহানুভূতিশীল-জনগণের মাঝে পার্টিকে আর্থিক ও বৈষয়িক সহায়তাদান-যে রাজনৈতিক কাজেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে বিষয়টিতে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। কমরেডদেরকে সরল জীবনযাত্রা ও কঠোর কাজ করার অভ্যাসকে রপ্ত করে খরচ কমাতে হবে। এর সাথে রাষ্ট্রীয় ও শত্রু-সম্পদ দখলের কর্মসূচিকে সামরিক অভিযানে যুক্ত করতে হবে।

নতুন থিসিসে ১১টি মূল করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এখনো প্রযোজ্য। সেগুলোকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের কর্মসূচি দলিলটি অনেক আগের রচিত। এছাড়া দলিলটি রচিত হয়েছিল ৩য় কংগ্রেসে গৃহীত আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে। তাই, বর্তমান অগ্রসর চেতনা ও সংশোধিত লাইনগত অবস্থানকে ধারণ করে এ ধরনের একটি নতুন দলিল প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

– সারসংক্ষেপে বলা যায়, বর্তমান বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় হলো মাওবাদী/বিপ্লবী কমিউনিস্ট শক্তি-কেন্দ্রকে সতর্কতার সাথে রক্ষা করা, ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ধাপে ধাপে তাকে লাইনগত ও বস্তুগতভাবে বিকশিত করার কার্যক্রম পরিচালনা করা, এই বিপ্লবী কেন্দ্রের সশস্ত্র অস্তিত্ব কিছু রণনৈতিক এলাকাকে ভিত্তি করে যতটা সম্ভব বিস্তৃত করা এবং সামরিক উল্লম্ফনের প্রশ্নটিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

উপসংহার

রিপোর্টটিতে ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলন-পরবর্তীকালের পরিস্থিতির উপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হলেও বহু বিভিন্ন বিষয়ে ৩য় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী পরিস্থিতি, বিশেষত সেই কংগ্রেসের মূল লাইনগত সারসংকলন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। একইসাথে রিপোর্টটিতে ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত "নতুন থিসিস"-টির পক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই, এই রিপোর্টটিকে নতুন থিসিস-এর সাথে যুক্তভাবে গ্রহণ করলেই শুধু একটি সামগ্রিক অবস্থান ও মূল্যায়নে আমরা পৌঁছাতে পারবো। এই রিপোর্টটি নতুন থিসিসের অবস্থানটিকে বিকশিত করেছে মাত্র।

এই রিপোর্ট ও নতুন থিসিসের ভিত্তিতে আমাদেরকে বিশ্ব ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে এবং দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে রক্ষা ও বিকশিত করতে হবে। তার ভিত্তিতে এদেশে একটি একক ঐক্যবদ্ধ মালেমা-বাদী পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই লক্ষে সমগ্র পার্টি এগিয়ে চলুক বিজয়ের ও বিকাশের পথে, সেজন্য সকল ধরনের প্রতিকূলতাকে, ত্যাগ ও কষ্টকে সাহসের সাথে এবং বিপ্লবী স্পৃহায় অতিক্রম করুক– এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

*****